KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৬ নর্থ রোড, যাদবপুর, কল-৩২
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
Title : অলিন্দ (ALINDA)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : (গ্রীষ্ম সংকলন) (শরৎ সংকলন) (গ্রীষ্ম সংকলন) (শারদ সংকলন)	Year of Publication : ১৩৯১ ১৩৯১ ১৩৯২ ১৩৯৪
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

শরৎ সংকলন

১৩৯১

আলিন্দ

সম্পাদক

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

WITH BEST COMPLIMENTS
FROM :

A WELL-WISHER

অলিন্দ

ষাণ্মাসিক সাহিত্য সংকলন

শরৎ ১৩৯১

সন্তোষকুমার ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, আলোক সরকার, তারাপদ রায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, কৃষ্ণা বসু, দিব্যেন্দু পালিত, কেদার ভাদুড়ী, উৎপলকুমার বসু, রবীন সুর, ভাস্কর চক্রবর্তী, রত্নেশ্বর হাজরা, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, রথীন্দ্র মজুমদার, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবারতি মিত্র, দীপঙ্কর সেন, রাখাল বিশ্বাস, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবদাস আচার্য, সুজিত সরকার, দেবী রায়, অমিতাভ গুপ্ত, শিবায়ন ঘোষ, অভিরূপ সরকার, দীপ সাউ, সুবোধ সরকার, দীপক রায়, নির্মল হালদার, দেবব্রত ঘোষ, সঞ্জয় রায়, রাজকুমার রায়চৌধুরী, সৈয়দ সমিদুল আলম, দিব্য মুখোপাধ্যায়, বৃন্দাবন দাস, অজিত বাইরী, প্রমোদ বসু, পিনাকী প্রসাদ ধর, সত্য বিশ্বাস, জহর সেন মজুমদার, সুভদ্রা ভট্টাচার্য, রাণা চট্টোপাধ্যায়, নির্মল বসাক, পবিত্র সরকার, মনীন্দ্র গুপ্ত, অমর দে, মৃণাল দত্ত, শ্যামলকান্তি দাশ, ব্রত চক্রবর্তী, অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়, অরণি বসু, শুকতারা রায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত।

সম্পাদক ও প্রকাশক : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ : মেরিঅ্যান দাশগুপ্ত

পৃষ্ঠপোষক : ডক্টর পার্থ দাশগুপ্ত

মুদ্রণ : ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস। কলকাতা-৯

দাম : চার টাকা

"অলিন্দ" ষাণ্মাসিক সাহিত্য-সংকলন।
প্রতি সংকলনের দাম চার টাকা।
গ্রাহক করা হয় না।
লেখকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যদি
তাঁদের রচনা বিষয়ে সম্পাদকের মতামত জানতে চান
তাহ'লে যেন ডাকটিকিট-সহ খাম পাঠান।

□

লেখা, বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য বিষয়ে
যোগাযোগের ঠিকানা :
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
৩ নর্থ রোড, যাদবপুর,
কলকাতা-৭০০০৩২

টেলিফোন—৭২-২০২৫

মরণ রে !

মৃত্যুকে স্বচক্ষে দেখতে পাব
অসম্ভব এই আশাটা
কবেই-না অস্তে চলে গেছে।
মৃত্যুকে সবাই কিছু প্রত্যক্ষ করে না।
সকলেরই তবু কিন্তু মৃত্যু হয়ে যায়।
যেমন প্রস্রাব করে উল্লিঙ্গ বয়স।
এলানো বয়সকালে অনেকেরই
আপনা-আপনি কিন্তু
বিছানা-টিছানা ভিজে যায়

দুজাতের দুটি ধাতু
হওয়া আর করা।
এই-যা তফাৎ।
হাঙরের হাঁ-করা দাঁত (যদিও
হাঙর আমি অদ্যাপি দেখিনি)
দুপাটি আলাদা যদি, তবে
আলগা হাসি ;
মিললে আর বাঁচা নেই।
মরা।

গ্রহণবর্জন

গত দশ বছর ধরে এদের কাছে আমি শুধু রক্তের
কার্পাস থেকে সুনির্বাচিত সূক্তের মতো কথা বলে গিয়েছি—
তার বেশির ভাগই এরা না বুঝে প্রশংসা করেছে,
ধরতে পারেনি অনুস্যূত অমোঘ দুর্জ্ঞেয়তা। আমারও
দোষ কম নয়, এরা জানে ভেবে অসংখ্য কথা
লুকিয়ে রেখেছি টেবিলের নিচে, তাদের অমুক্ত
ছায়ায় প্রচ্ছন্ন রেখেছি—আমার বর্জিত সেই
সমস্ত কথা যদি এখন ফিরিয়ে আনতে পারতাম
এরা আমাকে বুঝতে পারত

আমিও কি সেই সব সরল ভাবনাগুলির সান্নিক
আলোয় নিজেকে আরো একটু চিনে নিতে পারতাম না ?

এক এক দিন

এক এক দিন সুনিশ্চিত চোখ খুলে ঘুম ভাঙে
সে এক অন্যরকম জাগরণ, যেন পাহাড়ী নদীর কিনারায়
একা বসে থাকা
তখন আকাশ আমার দিকে তাকায়
বারান্দার ফুল গাছটার প্রতিটি পাতা আমাকেই দেখে
পৃথিবী নিস্তব্ধ এবং আর কোথাও কোনো মানুষ নেই
এরকম একটা পাতলা অনুভূতি পাখির পালকের মতন
বাতাস কেটে ঘুরতে ঘুরতে নামে
আমার দু চোখ রক্তিম, শিরা উপশিরায় গত রাত্রির নেশা
ভারী চমৎকার পা ফেলে এগিয়ে যাই অলীকের দিকে
আমি চেনা জায়গায় নেই, আমি কোথায় আমি জানিনা
নিশ্বাসে পাই ছেলেবেলার শিউলি ফুলের ঘ্রাণ যেন
কিশোরীর সদ্য ফোটা, শব্দময় বুক
এইসব দিন এক জীবনে একটি-দুটি বারই আসে
তখন এই বিশ্ব অনায়াসেই অন্য কারুকে
দান করা যায়।

সতর্কতা বিষয়ক

কী বিশাল তালাগুলো।
ছুটির দিনের তালা, গোল মুখ, সরু ঠোঁট, কেবল সতর্ক হতে বলে।
দোকান খুলেছে আজ, শুক্রবার
সামান্য দেরিতে। বাঁচা গেলো।
কত কিছু চাই—
কাল্পনিক রমণীকে জড়িয়ে আদরে ঝুলছে
ছিটের শেমিজ
দেখছে বাবাস্যুট
দেয়ালে আটকানো লাল মোজা
চাই, চাই, শো-কেসের নিবিড় সংসার।
রঙিন ছাতার নিচে ভিতু মহিলারা হাঁটে
থেমে থেমে হাঁটে, আমি কটাক্ষ করি না।
ওরা পারিপাট্যলোভী,
দোকানী ও পথচারী—এ ওর মুখের দিকে চায়, যেন বেরাল, ইঁদুর—।
সবাই সতর্ক আছে
উলঙ্গ পাগল দ্রুত হেঁটে গেলো জেনিটাল ঢেকে, বুঝি সে-ও।
খটাখট খটাখট টাইপরাইটারে শব্দ হয়।

ট্রলের ওপর বসে চলাচল দেখছি আর ভাবছি, আজ শুক্রবার
চিঠি যদি পৌঁছয় মঙ্গলে
তারপরও চারদিন,
এর মধ্যে উত্তর দেবে না রাধানাথ?

লবঙ্গ ও পদ্মবীজ

অন্ধকার অডিটোরিয়ামে
একটা লবঙ্গ নিয়ে দিয়েছিলে ছুটে। পদ্মবীজ—মনে পড়ে?
একমুঠো মাটির মোড়কে পুরে
রেখে গেছি শহরতলির জলে, এইখানে।
এই যে এখানে, তারপর
সৌর স্নেহে বেড়ে ওঠে পদ্মবন—জটিল সংসার
এ কি শুধু উদ্ভিদবিজ্ঞান
বংশলতিকার খেলা—স্মৃতিচিহ্নহীন
কত দীর্ঘ মধ্যবর্তী প্রতীক্ষার কাল?

তরমুজ রঙের হাসি ঠোঁটে
প্রথম পদ্মটি ফুটি-ফুটি
তুমি এসো, পাপড়ি সরিয়ে দেখো
পরাগ-কেশর ঘেরা বীজের কোটর
খুঁজে দেখো আশেপাশে, ভাসে কিনা হালকা একটু ঘ্রাণ লবঙ্গের
ঝাঁজালো হাওয়ার পিঠে প্রথম পদ্মটি?

এ পর্যন্ত বলার আগেই
অন্ধকার সভাগৃহে জ্বলে উঠেছিল তীব্র আলো
উত্তাল ভিড়ের মধ্যে তুমিও নিখোঁজ, যথারীতি।
লবঙ্গ ও পদ্মবীজে যতটুকু বন্ধুতা হয়েছে
আপাতত তাই থাক তাহলে, কী বলো?

সুবিন্যাস

যারা এখনো উপস্থিত হয়নি যারা দেরি করে আসছে
তাদের জন্য আরো অধিক
প্রস্তুত হও। আমাদের আয়োজন ক্রমশ আরো বেশি
উৎসব, সমারোহ এবং উজ্জীবন।
যারা এখনো উপস্থিত হয়নি তাদের আসনগুলো

আরো অধিক মনোনিবেশ আরো অধিক সংরক্ষণ
দাবি করছে—পূরণ করো দাবি।
পর্যবেক্ষণ করো শীতলতা শূন্যময় অকম্প হিম—
যারা এখনো উপস্থিত হয়নি
অনিবার্য সেই পদধ্বনিগুলি অনিবার্য এবং নিশ্চিত।

আরো বেশি নিশ্চিত কর মনোনিবেশ মূক সাদা নিরতিশয়
ওই আসনগুলো কতো সজ্জিত আর
কতো বড় একটা সুবিন্যাস। যে কোনো সুবিন্যাস
এতো বেশি ভয়াবহ! প্রস্তুত হও
যারা দেরি করে আসছে অর্থাৎ যারা এখনো

উপস্থিত হয়নি অর্থাৎ আমন্ত্রণ রটিত হয়নি এখনো
যাদের কাছে, সেই মেঘময়তা
তাদের জন্য রচনা করো আয়োজন। আরো আরো সংরক্ষণ করো
আসনগুলো, আরো আরো সুবিন্যাস—
শূন্যময় অকম্প হিম যারা এখনো উপস্থিত হয়নি।

তাঁদের খুঁটিনাটি

তাঁরা আমাদের গোঁফখেজুরে ভেবেছিলেন
অথচ আমাদের মধ্যে অন্তত একজন আছেন কর্মবীর
তাঁর সম্পর্কে কিছু না জেনেশুনে
তাঁকে আর দশজনের সঙ্গে গোঁফখেজুরে ভেবে
তাঁরা খুবই অপরাধ করেছেন।

সুতহিবুক লগ্নের প্রতি তাঁদের ঝোঁক
রাজযোটক আর অমৃতযোগ নিয়ে তাঁদের বাড়াবাড়ি।
এ দিকে শনিবার বারবেলায় আজ গোধূলি লগ্নে চাঁদ,
আজ বিকেলেই আমাদের সাধের বেড়াল মৎসমুখীর
চমৎকার তিনটে ছানা হয়েছে
তিনটে ছানাই সাদা কালো।
ছানাদের কোলের নিচে ঢেকে মৎসমুখী
রাগে বা আনন্দে গরগর করছে।
তাঁদের এখনো একবার ভেবে দেখা উচিত
সুতহিবুক লগ্নে কি এসব হতো?

প্রসঙ্গত আরো একটা কথা বলছি
তাঁরা মুড়ি-মিছরি একদর করে দেবেন বলেছিলেন
অবশেষে এখন মুড়ির দাম
মিছরির চেয়ে বেশি হয়ে যাওয়ায়
তাঁরাই বলুন,
তাঁদের কি এখন একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাওয়া উচিত নয়।

সিদ্ধান্ত

ভেঙে গেছে ;
খণ্ডগুলি এইবার তুলে নাও
তোমার ভুলের জন্য
যেন কেউ রক্তাক্ত হয়না।
মানুষ এখন আর
পায়ে-পায়ে তাকিয়ে হাঁটেনা।
হয়তো সে আকাশেও প্রকৃত তাকাতে ভুলে গেছে,
সমান্তর দুঃখ সুখ
সাধারণ আলো-অন্ধকার ছাড়া
মাথার ভিতরে কোনো ইন্দ্রিয়সমীক্ষা নেই
তোমারও ছিলনা, তাই
হাত থেকে
নেমে গেল কাঁচ !
একমুখ দেখার আয়না
মুখর পতন-শব্দে
একাধিক ধিক্কারে
ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

তুমি নত হও
বহুমুখী ছোট্ট টুকরো প্রতিচ্ছবি
সাবধানে সংগ্রহ করো,
ঐখানে
শব-সম্ভাবনা আছে,
অন্য মানুষ কেন
তোমার ভুলের জন্য রাঙা হবে ?
মানুষের দেহে আজ রক্ত বড় কম।

সর্পলেহনা

তছনছ শিরা,
ফেটে পড়ে বদরক্ত,
শুকনো পাছায় তবু কে সেঁটেছে
দশাসই রাজতক্ত,
শত ঝাঁকিতেও নড়ে না,
কপালে চাপানো পাথর
গড়ায় কিছুতে গড়িয়ে পড়ে না,
বাঁজা-পোড়া মাটি এখন সর্পলেহনা,
রায় বেশে-দেশে
হঠাৎ চেঁচিয়ে ঘোর অঘটন চেয়ো না।

সব কিছুতেই থোড়াই পরোয়া যার
তার ঠুঁটো হাতে
একাগ্রী কোন ভরসা ?
তবে কি ত্রিকালও অন্ধ,
কোনো বন্যাই ফাটাতে পারে না
বাঁধের কোমরবন্ধ,
দারুণ সোহাগে কাকে ভেবেছিলে
পিরিতের লিচ্ছবি ?
সে এখন দশ-ভাতারি,
নষ্টা, কস্‌বি !

তাড়াহুড়ো আছে ? যেয়ো না।
এভাবে নিজের
আখের চিবিয়ে যেয়ো না।
জাপ্-পুষ্পকে সে তো বহু আগে

জ্বলে উঠেছিল হাঙ্কাও
কবিতায়, বিপ্লবে,
আজ বাঁজা মাটি বিষিয়ে সর্পলেহনা—
রায়বেশে-দেশে
হঠাৎ চেঁচিয়ে
অঘটন কিছু চেয়ো না।

কৃষ্ণা বসু

তোমার সোনার জমি খেয়ে গেছে নুনে

তোমার সোনার জমি খেয়ে গেছে নুনে,
সমুদ্রের কোলাহলে, তার উচ্ছিষ্টের গ্রাসে,
তোমার জমির স্বপ্ন নোনা হয়ে গেছে;
তুমি জেগে থাকো ঘোর রাতে অজ্ঞানের হিমে
তুমুল জ্যোৎস্নার ভিতর,
তোমার অস্পষ্ট চোখে লেগে আছে মায়া, খুব স্বপ্ন ঘোর,
ভোরের আশায় জেগে থাকো,
ভাবো ঝুঁঝকো নরম ভোর এসে তোমাকে ছাখাবে
ঠিক স্বপ্নের ফসল, সারারাত জেগে থাকো
স্বপ্নে, ঘোরে, কল্প চাবিতার ঘনিষ্ঠ ডানার ভিতর,
অজ্ঞাণের রোদ এসে শান্ত শিশুর মতন
ঘুম ভেঙে জেগে আছে,
তুমি নষ্ট স্বপ্নের ভিতর থেকে জেগে উঠে ছাখো
তোমার সোনার জমি ছেয়ে আছে
স্বেচ্ছাচারী সমুদ্রের সংক্রামক নুনে—

দিব্যেন্দু পালিত

এই যে নিরভিমান

এই যে নিরভিমান এরই কোলে রেখেছিলে মাথা।
আজন্ম সবই কি তবে বৃষ্টি ও ঝড়ের পরে
প্রাকপরিচয়হীন ঋষির মতন
বৃক্ষের দরজায় এসে ছাখে মূল উৎপাটিত
ঝুরঝুরমাটি ও শিকড়ে;
হঠাৎ তাড়িত মেঘে শুধু পিঁপড়েরা করে খেলা!

আজও কি নিরভিমান শেখায় তোমাকে
শোক, শান্তির মতন
আছে সমাদর কিছু? কেন আজও দৃশ্যের আড়ালে
মঞ্চের সমূহ থেকে চ'লে গিয়ে দেখে নাও ক্ষত
আর কতোদূর যায়, ঠিক কতোদূর গিয়ে
থেমেছে সময়!

কেদার ভাদুড়ী

পিঠে কুঁজ ঝাড়ু হাতে

মাষ্টারদের পেটে একটু খোঁচা দিয়ে দেখবেন
নাড়িভুঁড়ি ছাড়া আর কিছু বেরোবে না।
ডাক্তারদের গেঁটে বাত সারেনা, দেখেছি।
ইঞ্জিনিয়ার? ফুঃ

তার চেয়ে শওকত মিয়াঁ ও তার ছেলে যারা লেদ মেশিন চালায়
রাজন, যে রিক্সাগাড়ি ঠ্যালে
এবং মাহাতো, যে আখমাড়াই কলে
পিঠে কুঁজ ঝাড়ু হাতে এতোয়ারি ডোম

এরপরেও কি তোমার বিক্রম ভেসে ওঠে জলে?

উৎপলকুমার বসু

একটি কবিতা

কবে
আমার রক্ত থেকে মদ হবে
কবে
এই হাড়
টুকরো হবে, গুঁড়ো হবে, তৈরী হবে বালির পাহাড়
কবে
প্রকৃত উৎসবে
এ-করোটি দ্বিখণ্ডিত হবে
আজ
চৈতন্য যে-ভাবে তাকে ছুঁয়ে থাকে
সেই মতো অচৈতন্য থাকি

রবীন সুর

পিছন দিকে ফিরে

শেমিজের ঘেরাটোপ দুধগন্ধ কোমল মুখের
কপালে সিঁদুর টিপ। নোয়াটির প্রতিবেশী শাঁখা,
আলতা গোড়ালি ছুঁয়ে লালপেড়ে শাড়ির প্রতিমা
মা আমার দুর্গা যেন রান্নাঘর পুজোর প্যাণ্ডেলে।
উনুনের ধোঁয়া-ধুপ, বাসনপত্রের শব্দে বেজেছিল কাঁসি,
গর্জনতেলের দীপ্তি-ঘাম অন্নপূর্ণা, মহানবমীর জমকালো
তিথি ছিল প্রতিদিনই—সন্তানের দুধভাত ইচ্ছাটির
প্রদীপ-জ্বালানো-সন্ধ্যা তুলসীতলা, কার্তিকের আকাশ নিশানা!
কেরাসিন-পোড়া রাত, নারকোল ছোবড়ার ধুনো-ধোঁয়া;
ধারাপাত মুখস্থের ঢুলে-পড়া ক্লান্ত শরীরের
যখন সমস্ত ইচ্ছা পরিপাটি বিছানার দিকে
কুক্কুশ-পশম-সুতো ছুঁচ-ফোঁড় ঘুম নেই নিঃশব্দ সেলাই!

ভাস্কর চক্রবর্তী

আলোক সরণী

ট্রামের জানালা দিয়ে চৈত্রদুপুরের মুখ গড়িয়ে চলেছে—
তুমুল তিতির দিকে? প্রার্থনাসঙ্গীতে?
আস্তানা পেয়েছি আমি—দিন আর রাতের আশ্রয়
পেয়েছি, তবুও সাপ
ফণা তোলে; আমি আরো শান্ত হই, শান্ত হয়ে দেখি
যে দুপুর আমরা চেয়েছিলাম দু'বছর দশবছর আগে
সে দুপুরই এসেছে তো—পতাকা উড়ছে দূরে কাদের বাড়িতে—

যখনই তোমাকে আরো মনে পড়ে, ভাবি, শুধু কবিতা লিখবো।

এলিজি

বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে সন্ধেবেলা
তোমাকে, সবিতা দেবী, মনে পড়লো আজ।

আলো ছিলো—তবু ফের ম্লান হোলো মুখ!

আমিও কিশোর, তুমি জেনেছিলে যেন!

ডানা ঝাপ্টাতাম আর উড়ে এসে চুপচাপ
নামতাম তোমার উঠোনে।

কী শান্ত বিকেল সব···গোধূলিবাতাস···
যদিও বিশ্রী এক চাঁদ আজ উঠেছে আকাশে।

ধুলোয় দাঁড়িয়ে আছি

অনেকগুলো গন্ধ এনে কারা যেন ফেলে রেখে গেছে
আমার পায়ের কাছে
ধুলোয়
আমি দাঁড়িয়ে আছি দুই হাত পেতে—
ওখান থেকে কয়েকটা গন্ধ আপনারা কেউ
আমার হাতে কুড়িয়ে দেবেন।
আমার গা গতর এখন উদোম দারুণ শীত
ঠাণ্ডায় কেঁপে কেঁপে উঠছে শরীর
কারা যেন স্বপ্নের উষ্ণতাগুলো ফেলে রেখে গেছে
আমার পায়ের কাছে
ধুলোয়
দুই হাত পেতে আমি দাঁড়িয়ে আছি একা।
ওখান থেকে কয়েকটা উষ্ণতা আমার হাতে
আপনারা কেউ তুলে দেবেন!

অনেকগুলো দুঃখ বহন করতে করতে কারা যেন
কয়েকটা দুঃখ ফেলে রেখে গেছে
আমার পায়ের কাছে
ধুলোয়
আমি দাঁড়িয়ে আছি দুই হাত পেতে। কেউ
ওখান থেকে স্মরণযোগ্য কয়েকটা দুঃখ
আমার হাতে কুড়িয়ে দিন না!

প্রবাসী বন্ধু

যে স্বপ্ন আমার কখনো পূর্ণ হবে না
আমি কি এতদিন ধরে তার কথাই লিখে যাচ্ছি?
গ্রহান্তরে দশবার পাড়ি দিয়ে ঘুরে এল রকেট
তবু আমার সেই লেখাটি আজও ছাপানো গেল না।
ধুলো কাদায় কখন যেন হারিয়ে গেল কবিতার রোগা খাতাটি।

প্রবাসী বন্ধু, তোমার দেশে আছে সুবর্ণরেখা
অথবা ময়ূরাক্ষী, না হলে অজয়
নদীর নাম বাঁশলইও হতে পারে
বড় সেই টিলার নাম কে রেখেছে ধরণীর পাহাড়?…
তোমার দেশে গ্রীষ্মই ভালো লাগে
তৃষ্ণায় জল খেতে নামি সুবর্ণরেখায়
রোগা মেয়ে ময়ূরাক্ষী, তবু তার আছে স্রোত
সে স্রোতে মুখ দেখা যায় না, চেনা যায় নিজেকে এখনও
কিন্তু আমি কি নিজেও জানি কেন এত দেরি হল আমার?
কখনো কি বলতে পারব
রোগা মেয়ে, ও রোগা মেয়ে, তোমায় খুব ভালো লাগছেগো
আমায় সঙ্গে নেবে?

সহজ

সহজ করা সম্ভব নয় সব কিছু
এই যে হাত ধরে আছি,
এই যে তুমি আরেকটু স্বাধীনতা দিলে আমাকে
সহজ, এতই সহজ!
সব কিছু পেয়েও যে একদিন
সব কিছু ছেড়ে চলে যায়

তারই কবিতা একদিন টাঙানো হবে
দেয়ালে দেয়ালে ;
জনগণের ওগো কবি,
এখন আমরা তোমার কাছে
শুনতে চাই প্রেমের কবিতা,
মানুষের জন্যে মানুষের সত্যিকারের
সুখদুঃখের কবিতা—
এই যে হাত ধরে আছি
এই যে শুঁড়ো শুঁড়ো চকখড়ির মতো
গায়ে লেগে আছে শিহরণ;
এতদিন পর্যন্ত অজানা এক গন্ধ
বলো সহজ, এতই সহজ ?

রথীন্দ্র মজুমদার

এই নিয়তি

আমার প্রতিটি শব্দই জানে এই জেগে-থাকার নীরবতা
ভেসে-আসা বাতাস, বৃষ্টির সুর, ফুলের গন্ধের হাহাকার
পাখির গান, গাছের পাতার কম্পন, লতা-পাতার
কে জানে ঝড়ের বাতাসে ধুলোরা পেতে চায় কাকে
বহুদূর থেকে তোমাকে ডাকা, ঢেউয়ের অন্ধকার
একা নৌকোর ভেসে-যাওয়া শূন্যতায়
ধূপের ধোঁয়ার ঘুরে-ঘুরে উঠে যাওয়া, ঘরের আকাশ
সারারাত নগ্ন ঘুম, চাঁদের আলো ঝ'রে যায়
তোমার দু'চোখের ভাষা, এপার-ওপার স্তব্ধতা
এই নিয়তি, বাঁচা, এই তৃষ্ণা, নিশ্বাস, জেগে-থাকার !

দুটো পদ্ম

না
আর ঘুমোনো নয় -

হঠাৎ দুটো হাত
হঠাৎ দুটো হাড়
জলের ভেতর থেকে
গলার চারপাশে
এবং

রাতে এইমাত্র একটা প্যাঁচা ডেকে ডেকে
বারান্দায় সিগার পুড়তে পুড়তে
যে দিকেই তাকাতে তাকাতে
কালসিটের দাগ
এবং

আলো না ফোটা পর্যন্ত
যে কোন মুহূর্তে
জলের ভেতর থেকে
দুটো হাত
দুটো হাড়

দুটো ভয়ংকর পদ্ম
এই বুঝি ফুটে উঠতে উঠতে

দেবারতি মিত্র

আলোর শুরুতে

সে হারিয়ে গেছে, আর কখনো ফিরবে না।
ময়ূরডাকের মতো কর্কশ ফাটলে
আজও জমে আছে জল—
অশীর্ণ অচল চাঁদ সেগুন পাতার ছায়া
তার বুকে স্থির
পাহাড়ের কোলের ছেলেটি যেন
মাতৃগর্ভে মৃত : ছায়া, ছায়া, টানা ছায়া
ভিতর পাখির গায়ে পড়ে বিচ্ছুরিত হয় না কখনো
তবু কোনও অর্ধশূন্য বোতলে ভরেছি রূপ
গেছি তার পাশে,
আগুনের কড়া গন্ধ নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
বিরহ না, না বিষাদ।

বাঁধ ভেঙে চোখ ফাটে
হাওয়ার স্খলিত মুখ দেখে,
কবে সে নিশ্চিহ্ন হ'লো ?
কবে বিনা কোলাহলে অচনাই হ'লো অবসান।
চুপিসাড়ে মাথা তুলে চেয়ে দেখি
চোখ থেকে দুটি শেষ-আলোর বোঁটাটি
খ'সে পড়ে যায়
দূর পর পারে।

রূপকীট

ক্ষতি করা খুব ভুল,
শরীর ও হৃদয় আমার, কেন বিগলিত হও
একটি আতসী কুঁড়ি দেখে ?

কবে আত্মপল্লবের কাকে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে আসা
ফাল্গুনের রোদ্দুর, ঘন মুকুলময়
ওদের ওপরে এত লোভ ?
কিশোরীর তিলফুলঘ্রাণ বুক
তোমাকে মোহিত করে—
তুমি চোখ দিয়ে ছোঁও
সমকামিতা কি নয় ?
রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় তরুণতরুণী—
আফ্রোদিতি-অ্যাডোনিস ভেবে আঁক পট,
সবচেয়ে ভাট অথবাই উপচে যাও
সদ্য বসন্তের কোনও অস্ফুট যুবক
পথে দিয়ে চলে গেলে
ফুটিয়ে তুলতে তাকে চেষ্টা কর নিজের উত্তাপে।
হৃদয়ের এইসব আগ্রাসী লবণ
যাতেতাতে মিশিয়ে মেশাও তুমি,
জ্ঞানের আপেল গাছ চেনায় নি
এখনও তোমাকে কোনও সাপ ?

দীপঙ্কর সেন

প্রযোজনা

পাইথন ছিলো আর একটা মাথা—এ'কথা ভাবতেই মনে
প'ড়ে গেলো সেই নারীর কথা যে তার নেপথ্যকে বালির
অনেক নীচে চাপা দিয়ে রাখতো আর ঘৃণায় ছটফট
ক'রে ঘুমোতে পারতো না দিনের পর দিন কারণ
সেই সাপ দু'টোর চারটে চোখ তাকে রোজ সেই
গভীর নীল বিষের গল্পটা শোনাতো আর শুনতে
শুনতে হাত বাড়াতে বাড়াতেই পথের কাদায়
উগ্‌রে দিতো আভ্যন্তরীণ বিষ প্রত্যহ ছুঁয়ে ছুঁয়ে

এসো ডাক দাও

জীবনের সমস্ত অন্ধকার ছড়িয়ে দিয়ে আমি একদিন দেখতে চেয়েছিলাম
মানুষের নিস্তরঙ্গ বুকের তলায় জমে থাকা দুঃখ
আকাশের মতো বিস্তৃত অভিমান
টুকরো টুকরো শব্দে-ঘেরা মর্মভেদী গানের সেই দীর্ঘ স্বরলিপি
ছেঁড়া সুতোয় বাঁধা স্বপ্নহীন যে জীবন, আমি একদিন তার দিকে
চোখ রেখে
চমকে উঠেছি, চরাচরের ঘোর আঁধারের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখেছি
বিহ্বল মুখের পাশে উড়ে যাওয়া শুষ্ক পালক আর ছিন্নমূল মানুষের
ভেঙে যাওয়া সুখের প্রতিচ্ছবি, বেঁচে থাকার অভিমান।

ভুল পথে দাঁড়িয়ে এক করুণ শিশুর মুখে প্রথম তালপাতার বাঁশির শব্দ শুনে
আচমকা বলে উঠেছিলাম "সুন্দর"
তারপর প্রলম্বিত স্মৃতির মধ্যে সাঁতার কাটতে কাটতে জেনে নিয়েছিলাম
গোপন রহস্যময় অঙ্গের লাবণ্য,
সারাক্ষণ লোভীর মতো ছুঁয়ে থেকেছি গন্ধময় নাভির দু'পাশ
তাৎপর্যময় জীবনকে বুঝে নিয়েছি বেআব্রু জীবনের মগ্নতা দিয়ে
দিক-হারানো নদীর কোনো বাঁকে বসে যখন ঝুঁকে পড়া মেঘের দুপুর
কাটিয়ে ফিরে এসেছি
আর ঠিক তখনই টের পেয়েছি আমার ভিতর থেকে আরো এক আমি
এক জন্মের থেকে আরো এক জন্ম
কী বিমুগ্ধ সমারোহে ডুবে যাচ্ছে রক্তিম আলোর মধ্যে।
যে নারীর চোখের জলের দিকে তাকিয়ে অনুভব করেছি
যার জীবনে কোনো সূর্যোদয় নেই
যে মুখে এখনো বান্ধবীর চুম্বনের দাগ শুকোয়নি
যে পাখির বিষণ্ণ ঠোঁটের শিসে কেঁপে ওঠে রাত্রির নির্জনতা
যে মুখে এখনো লেগে আছে শুকনো হাসির সরু রেখা

যে মুখের পাশে এখনো নেমে আসে আদিম স্বপ্নের অনন্ত নির্জন
বাইরের থেকে আমি তাদের সাড়া দিই, চীৎকার করে বলি, আছি, সঙ্গে
আছি
তবুও আশ্চর্য আঁধারের মধ্যে
লক্ষ করেছি মর্মের কি বিপুল উৎসর্জন
ভিতরের টান থেকে শুধু ঝরে পড়ছে আরো এক লুব্ধ টান
সাদা দেয়ালের ঘর থেকে খসে পড়ছে ঝর্ণার জলের মতো পলেস্তারা
আমি এখনো বেদনাময় এক শিখর থেকে বুঝতে চেয়েছি
কেন ওইভাবে খসে পড়তে হবে? হয়তো হবে না
যে বুকের ওপর সেতারের সুরের মতো আজো বেজে ওঠে
ঈষৎ আলিঙ্গন
প্রতিফলিত হয় ভাষার থেকে আরেক ভাষার
দেখা হয় তাই ছুঁয়ে থাকি, বিষণ্ণ এক মানুষের মতো চেয়ে দেখি
মাথার ওপরে আছে ভালোবাসা, তাই ছুটে যাই, ছুটে যেতে হয়।
আজ কার কণ্ঠস্বরে নড়ে ওঠে এই দগ্ধ মূল? বার বার আঁখির পল্লবে
ডাক দাও, এসো ডাক দাও।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

রক্তফেনা

এই ভগ্নস্তূপের শেষ স্তম্ভটা আমি আঁকড়ে ধরে আছি। আমার পরিণতি আমি জানি না। আমার মৃত্যুও হয়েছে কিনা—। অসংখ্য হাতের আঙুল, তারাও ফিস্ ফিস্ করে কী সব বলছে, হয়তো পুনর্জন্মের কথা। হয়তো রাত্রির অন্ধকারের কথা। এই পৃথিবীর স্তব্ধতার দোঁয়ায় কার দমফাটা চীৎকার। হয়তো আমার। ওই তো, একটা হৃদপিণ্ডের মধ্যে একটা মাকড়সা, আর তার শাদা ডিমগুলো। রক্ত আস্তরণগুলো কেটে দিচ্ছে একটা ধার ছুরি প্রতিনিয়ত। হয়তো, ওই পরিচিত রক্তে একটা প্রেতাত্মা এক্ষুনি স্নান সারবে, হয়তো আমি। যন্ত্রণার ক্ষত মুখে ঘড়ির সেই শব্দগুলো—যা কান্না হয়ে আছে এই ভগ্নস্তূপে, আমার কঙ্কালের শাদা হাড়ের মধ্যে, খুলির চোখের গর্তে।

চলো, পৌঁছে যাবো

আবার গোধূলি এলো, চলো
পৌঁছে যাবো, আর একটু হাঁটি

কেবল ছুঁড়েছি তীর, শব্দ ভেদী
যদি ভুল হয়—অভিশাপ এসে
সারা জীবনের স্তব তছ্‌নছ্‌ করে দেবে, জানি

আমি ও আমার স্বপ্ন—পরস্পর
কাঁধে হাত দিয়ে বেঁচে আছি
এক পা দু'পা হাঁটি
উভয়েই উভয়কে সান্ত্বনা দিই

আমার সামান্য অহংকার
যাকে আমি ঈশ্বরের মতো লালন করেছি
মাথা নিচু করে এই ঘরে ঢুকতে
কষ্ট পেয়েছেন

কোনো চাপ সহ্য হয় না আর
নির্ভার হেঁটে যেতে ইচ্ছে হয়
ছেলে বৌ সঙ্গে নিয়ে, যেমন বেদেরা যায়
থামে আর যায়

আশ্রয় ?
আর একটু চলো,
লবণের নৌকো বেয়ে সমুদ্রের বুকে

দেবদাস আচার্যের 'ঠুঁটো জগন্নাথ'

দেবদাস আচার্যের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মানুষের মূর্তি' প্রকাশিত হয়েছিল উনিশশ' আটাত্তরের শেষ দিকে। এই কাব্যগ্রন্থটি পাঠ ক'রে সম্পূর্ণ এক নতুন অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল আমার এবং আমার মতো আরো অনেক বাঙালা কবিতাপাঠকের। এর আগে নিউজপ্রিন্টে ছাপা কখনো কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। দ্বিতীয়ত, কাব্যিক শব্দ সম্পূর্ণ পরিহার ক'রে সার্থক কবিতারচনা যে সম্ভব, এই বইটিই তার প্রকৃষ্ট নমুনা। তৃতীয়ত, এই প্রথম বাংলা কবিতায় এমন কিছু চরিত্রের উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করলুম, যা ইতিপূর্বে ছিল না। আমার বক্তব্যের সমর্থনে একটি ছোট কবিতা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি :

সকালবেলায় সবকিছুই অল্প অল্প ক'রে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে
ছুতোর কাকা রাঁদা আর দুরপুন হাতে বেরিয়ে পড়েন কাজে
করমালি চাচার হাতে ওলন-দড়ি
মাধব জ্যেঠু ছুটো বলদ আর বিদে নিয়েছেন সঙ্গে
আমার বাবাও সাইকেলে চাপেন
তার কেরিয়ারে থাকে রুটি আর আলুচচ্চড়ি আর কাপড়-গামছার বোঁচকা
মা আর আমি বাবার যাওয়া দেখি, বাবা
ধূলোমাটির পথে একসময় মিলিয়ে যান
সারা দুপুর প্রখর রোদ্দুরের মধ্যে মা সংসারের কাজ করেন
আর বিড় বিড় ক'রে মাঝে মাঝেই বলেন—
'তুই জানিস খোকা, হাটে ছায়া আছে তো ?'

হ্যাঁ, 'মানুষের মূর্তি' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দেবদাস আচার্য বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে সংযোজিতহ লেন।

'ঠুঁটো জগন্নাথ' দেবদাস আচার্যের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। এটি প্রকাশিত হয়েছে উনিশশ' তিরাশিতে। পূর্বোক্ত কাব্যগ্রন্থটির সঙ্গে এই কাব্যগ্রন্থটির আকারগত সাদৃশ্য খুব সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। এটিও চার ফর্মার বই। নিউজপ্রিন্টে ছাপা। পেপাকব্যাক। অধিকন্তু, এই গ্রন্থের কবিতাগুলিও

তিনটি পর্বে বিভক্ত—রিপু, জাতকের কথা, ১৯৮২। কিন্তু এই আকারগত সাদৃশ্যকে সরিয়ে রেখে যদি আমরা কবিতাগুলির ভিতরে প্রবেশ করি, তাহলে বুঝতে পারবো, অন্তর্বর্তী পাঁচ বছরের দেবদাস আচার্য নিজেকে বেশ কিছুটা পরিবর্তিত করেছেন। এই পরিবর্তন আঙ্গিক কিংবা ভাষার দিক থেকে নয়, বিষয়ের দিক থেকে। গ্রামীণ জীবনের দৈনন্দিন আটপৌরে ঘটনায় নিজেকে সংশ্লিষ্ট রেখেও তিনি একটি বড়ো বিষয়কে ছুঁতে চেয়েছেন :

'পৃথিবীর বিশুদ্ধ একটা আত্মা রয়েছে, আমি যা ভেবে থাকি, খুব ধীর এবং বিশিষ্ট, আমি তার গমনাগমন কখনো কখনো আশা করি।

মেঘ উড়ে যায় ধীরে, কেয়াফুল ফোটে, নিমাই দাসের উঠোনে গরু বিয়োয়, এরও পাতায় শুয়ে থাকে গোবর্ধন আচার্যের চাষী বৌ, ছেলেরা স্কুলে যায়, হৈম গান করে—এদের ভিতর একটা আত্মার ধীর গমন আমি বুঝতে পারি, তবু এই ব্যাপ্তির বর্ণনার কোনো ভাষা আমার জানা নেই।' (আত্মা)

কতোখানি সৎ হ'লে একজন কবি এরকম বলতে পারেন : 'এই ব্যাপ্তির বর্ণনার কোনো ভাষা আমার জানা নেই।' শুধু এই কবিতাটিতেই নয়, সারা কাব্য-গ্রন্থটিতেই কোনো তথাকথিত আঁতলামো নেই।

দেবদাস আচার্য সেই বিরল কবিদের একজন যাঁদের কাব্যগ্রন্থের কবিতা-গুলির ভিতরের এক অখণ্ডতা বিরাজ করে। ফলত দু-একটি পংক্তিকে মূল কবিতা থেকে বিশ্লিষ্ট ক'রে তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য বোঝানোর চেষ্টা করা হাস্যকর। তাঁকে বুঝতে গেলে তাঁর কাব্যগ্রন্থটিই আদ্যন্ত পড়তে হবে। পড়লে দেখতে পাওয়া যাবে, একজন ছাপোষা মানুষ তার স্ত্রী-পুত্র-সংসার নিয়ে 'মফঃস্বল শহরের খাটো, ভোঁতা, ম্লান মূল্যবোধের ভিতরে' বেঁচে থেকেও জীবনকে নিবিড়ভাবে ভালোবাসতে চায়। ছোট ঘরে ছোট সুখ, ছোট দুঃখ, ছোট স্বপ্ন নিয়ে তার দিন কেটে যায়। আর তার আকাঙ্ক্ষা? তাও খুব ছোট: 'আমার সন্তানের জীবন আর একটু সুন্দর হোক।' কিন্তু অবাক হ'তে হবে তখনই, যখন লক্ষ্য করবো যে এই সামান্য অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সে পৌঁছে যায় এক অসামান্য উপলব্ধির জগতে। যেমন,

নিশানের মতো আছি খাড়া, জেনো
বাতাসে কেঁপেছি, রোদে উষ্ণ হয়েছি

দেখেছি অনেক লোক আজও স্থির চোখে
মুহূর্তের জন্যেও আত্মার সঙ্গে কথা বলে' (মোহ)

কিংবা

'আঁসে, কোসে, বাকলের অভ্যন্তরে দ'রে আছি
পৃথিবীর পারদ ও জল
কখন যে শিকড়ের সঙ্গে ঢুকে গেছি মাটির আত্মায়।' (উদ্ভিদ)

গ্রন্থটির শেষ পৃষ্ঠায় এসে দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে নিম্নলিখিত অংশে :

এই পৃথিবীর চেয়ে স্বর্গীয়, এমন কিছু আমি ভাবতে পারি না, কিন্তু, যারা এই পৃথিবীকে নরক বানাতে চেয়েছে, তাদের প্রতি আমি ঘৃণা জানিয়ে গেলাম, বারবার ঘৃণা জানিয়ে।'

দেবদাস আচার্য একবার একটি গদ্যে লিখেছিলেন যে আধুনিক বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের সীমারেখা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা বিষ্ণু দে পর্যন্ত না টেনে, চর্যাপদ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া উচিত। কারণ, তিনি মনে করেছেন, বাস্তবতাবোধ ও লোকায়ত জীবনাশ্রয়ী চেতনা, যা আধুনিক কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য, তা গোড়া থেকেই বাংলা কবিতায় বিদ্যমান ছিল। সংস্কৃত কাব্যে অভিজাত শ্রেণীর রাজকীয় মহিমার যে বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়, বাংলা কবিতা শুরু থেকেই তাকে এড়িয়ে গেছে। এদিক থেকে দেখলে দেবদাস আচার্য প্রকৃত অর্থেই এক ঐতিহ্য সচেতন কবি।

পরিশেষে বলি, পঞ্চাশ দশকের শঙ্খ-শক্তি-সুনীল-প্রণবেন্দু-বিনয়-আলোক-অলোক-উৎপলের পর পরবর্তী দুটি দশকে যাঁদের কবিতা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল তাঁরা হলেন কালীকৃষ্ণ গুহ, ভাস্কর চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, রণজিৎ দাশ, শ্যামলকান্তি দাশ, জয় গোস্বামী, নির্মল হালদার, আর হ্যাঁ, অতি অবশ্যই দেবদাস আচার্য।

ঠুঁটো জগন্নাথ □ দেবদাস আচার্য □ শোণপাংশু □ ২৮/২ কাঁটাপুকুর লেন, হাওড়া-৭১১১০১ □ চার টাকা

দেবী রায়

আরেক কলকাতা

ওপর ওপর চাকচিক্য, হালফিল বেড়েছে খুব
একে কি দারুণ সমৃদ্ধি বলো ? কংক্রিট স্থাপত্য……
দুষ্ট ব্রণের মতো মাঝেমাঝে থানাথন্দ, নিষ্ঠুর সত্য
দেখে-ও দেখিনা আমরা, তার অসহায় দু'চোখে জল !
ভিতরে-ভিতরে গুমরিয়ে কান্না, তিলে তিলে এক নিষ্প্রাণ ক্ষয় !

—এসব কে আর জরিপ করে ? কল্লোলিনী কলকাতার
ভোটারদের ভীষণ কমে গেছে সময় পেটের ধান্দায় আর
রাস্তার যানজট মিলে—যেন জলের মাছ ডাঙায়……

—জীবন কি গরলের মতো ঠেকে ?—ক্রমাগতি চুল্‌কোয় ?
'সহযোগিতা' কথাটিই কেন যে বাগাড়ম্বর মনে হয় !
মনে হয়, সবাই গিনিপিগ করা ভালোবাসায় মজেছে !
মিলের ভিতরে এতো যে গরমিল
তারো ভিতরে এক চিল্‌তে সহজ নিঃশ্বাসের মতো—

সল্টলেকের বুকের কাছে জেগে থাকে সাধের ঝিলমিল !

অমিতাভ গুপ্ত

ধ্যান

১

যেকোনো নক্ষত্র যাক অস্তআকাশের দিকে, রাতের ভ্রমর
যে কোনো বিশাল ডানা মেলে ঢেকে দিক
আমার মর্মর

শুধু জানি তুমি আছ—স্থির, সাম্প্রতিক।

২

ফেরো প্রতিমার দিকে, আরতিনৃত্যের
অনুনয়ে নম্র করো তোমার শরীর।
জানো কা'কে নিরঞ্জন বলে

জানো কা'কে নদী বলে ? ভেসে যাওয়া বলে ?

শিবায়ন ঘোষ

এটুকু তো জানে

দক্ষিণ ফ্রান্সের থেকে ফিরে এলে, 'আঙুর এনেছো' বলে ছুটে এলো রঞ্জনের বউ। সমীরণের গিন্নীও ঠিক এভাবেই আবুধাবির খেজুর চেয়েছিলো। বুখারার থেকে ফিরে এলে তোমার কলেজ পড়ুয়া মেয়েটিও তোমার কাছে এসে, এক দৌড়ে, কিসমিসের সন্ধান করবে। সমরখন্দের থেকে আসামাত্র, তরমুজও…

বোঝো

তবু ভালো ফ্রান্সের আঙুর জানে, আবুধাবির খেজুর জানে, এটুকু তো জানে।

অভিরূপ সরকার

চিঠি

কাচের শার্শিতে তোমার বিম্বিত মুখ, সারাদিন
বৃষ্টি পড়ছে, সেই সন্ধেবেলা, আমাদের দুজনের
একটি শহর ছিলো। তুমি কি তা দেখেছিলে?
ক্রমে বৃষ্টি থেমে এলো, বাড়ি ফেরবার পথে
দেখলুম, তোমার বাড়ির সামনে নতুন রাস্তা হবে,
পিচ ভর্তি মস্ত দুটো ড্রাম, তার নীচে আগুন জ্বলছে।

তোমার বন্ধুর সঙ্গে আজ দেখা হলো।
তার কাছে তোমার ঠিকানা পেয়েছি।

দীপ সাউ

আত্ম-প্রতিকৃতি

যখন আকাশ দেখে নীল মেখে যায়
দু-চোখে। ধীর মন্থর
পায়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে দীর্ঘ কান নেড়ে
মাছি তাড়ায় আর ঘাস খায়। মাঝে মাঝে
চেয়ে থাকে দূর দিগন্তরেখার দিকে।

স্ত্রী গাধার কথা ভাবে, তার প্রসবের
যন্ত্রণা ও হর্ষ—বড় বড় চোখে জল নেমে আসে
করুণ ও দীর্ঘমেয়াদী
সেদিন ডোবায় মুখ রেখে জল পানের সময় স্থির
হয়ে গিয়েছিল পীত ও কালো দাগ দেখে;
এই প্রথম সে নিজেকে চারদিকের মৃত্যু
ও রূপের মাঝখানে।

সুবোধ সরকার

গণ্ডার

মাথায় কেরোসিন
লাগিয়ে চিৎকার
করতে পারতাম।

বিছানা থেকে উঠে
ঘা নিয়ে সারাগায়ে
পালাতে পারতাম।

যে রাতে বিয়েবাড়ি
জমাট, অস্থির
জ্বলছে বেনারসী
পেছনে জামবনে।

সেখানে আমি একা
দুহাতে ক্রাচ নিয়ে
দাঁড়াতে পারতাম।

চোখের থেকে জল
তবু কি পড়ত না?

আকাশ ফাটিয়ে কি
উঠতে পারত না
হাতের ক্রাচ দুটি?

ওঠেনি। চুপচাপ
আমাকে যেতে দাও।

এসেছি দক্ষিণে
তোমার মুখ শুধু

এসেছি উত্তরে
তোমার মুখ শুধু

বাতাস তছনছ
করছে মরুপথ
করুক ; আমি যেন
হাঁটছি গণ্ডার।

দীপক রায়

লৌকিক

থামো বরুণদেব থামো। আমাদের টালির ঘর ভেসে যাচ্ছে। তিনদিন টানা বৃষ্টি হচ্ছে। মাটির দাওয়ায় কোথায় বিছানা করি। কোথা শুই। কালো হয়ে বৃষ্টি নামছে শুধুই। শুধু ঝড়। বরুণদেব থামো।

বাবা বললো উঠোনে পিঁড়ি পেতে দিতে। পিঁড়ি পেতে দিয়েছি। বোসো বরুণদেব বোসো।

মা বাবা নিয়ে বাড়ীতে ন-জন থাকি। নারকোল গাছ হাওয়ায় দুলছে। বরুণদেব থামো। এই গভীররাতে আমাদের কারো চোখে ঘুম নেই। আমাদের কুকুর আতঙ্কে উঠোনে দাঁড়িয়েছে পাথরের মত। দূরে বজ্রপাতের শব্দ। আলো এসে পড়লো আমাদের বাড়ীতে। মাটির দেওয়াল পড়ে যাচ্ছে। নারকোল গাছ দুলছে। আমাদের বাড়ীর ওপর। থামো বরুণদেব, থামো।

উঠোনে পিঁড়ি পেতে দিয়েছি, থামো।

নির্মল হালদার

আজ

সুপারি দিয়ে নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছি
চাঁদতারা আলোর নিচে সাতগাঁয়ের লোক এসো
আজ আর হাজাক জ্বালবো না
ফর্সা কাপড় পরবো না
আজ আর ছেলের বিয়ে মেয়ের বিয়ে নয়
আজ আর লুচি বোঁদে নয়
আজ মাটি নিয়ে আমাদের আলোচনা

একবছর ফসল পাই এক বছর পাই না
মাটি দোষী না আমরা, নাকি মাটির আড়ালে
কেউ আছে
যে আমাদের কষ্ট দেখে হাসে সুখ দেখেও হাসে

কই গো আকলু দাদা
তুমি আগে এসো
শুরু করো সভা—
শিয়াল কাঁটা ফুলের শোভায় পেট ভরে না

বিবাহ

গাছকে আগে বিবাহ করি
গাছ কতোদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে
গাছে হলুদ সুতা বেঁধে
গাছকে আগে বিবাহ করি

পরে টোপর মাথায় বউকে নিয়ে
গাছের তলায় অপেক্ষা করবো বাসের জন্যে
গাছ ডালপালা ঝুঁকিয়ে
আমাদের মাথায় রাখবে হাত

নির্মল হালদারের কবিতা

'আশ্বিনের ধানে জমে ওঠা রঙ কলমে এসো'

নির্মল হালদারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অস্ত্রের নীরবতা'র ২৬ ও ২৭ পৃষ্ঠায় পর পর দু'টি কবিতা আছে। ২৬ পৃষ্ঠায় আছে 'গরীবের শিল্প' এবং ২৭ পৃষ্ঠায় আছে 'নগর কেন্দ্রিক'। ঐ কবিতা দু'টির মধ্যে থেকে পাশাপাশি কয়েকটি পংক্তি তুলছি 'গরীবের কাঁথা কানিতেই প্রমাণ আছে/গরীবের শিল্প বোধ' (গরীবের শিল্প) এবং 'নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে লেখা/লেখা কি আমার? আমি ঐ লেখার মধ্যে পেয়েছি বাবুয়ানি/বাবু সমাজের রা (নগরকেন্দ্রিক)। নির্মলের ভিতরকার Contradiction ওর 'অস্ত্রের নীরবতা'র ঐ কবিতা দু'টিতে চমৎকার ভাবে ধরা পড়েছে। ঐ দ্বন্দ্বের ভিতর থেকে উঠে আসা নির্মল 'পুরোনো এ জীবন আমাদের নয়'-এ অনেক বেশি উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে কি কবি কি পাঠক অনেকের মুখেই আমরা অভিযোগ শুনেছি—বাংলা কবিতা নগরকেন্দ্রিক—নাগরিক মানসিকতা কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। কাকে বলে নাগরিকতা, কাকে বলে নাগরিক মানসিকতা—এই তর্কজাল বিস্তারের সুযোগ এখানে নেই। নাগরিকতা কতটা সহনীয়—কতটা-ই বা বর্জনীয় সে প্রসঙ্গেও যাওয়ার সুযোগ পাব না এখানে। কিন্তু 'পুরোনো এ জীবন আমাদের নয়'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে নির্মলের অনাগরিকতা-ই আমাকে নির্মলের প্রতি বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট করেছে। গড্ডল স্রোতে নির্মলকে আলাদা করে চিনে নেওয়ার সুযোগটুকু আমি এ কারণেই পেয়েছি।

নাগরিকতার বিপরীত শব্দ কি গ্রাম্যতা? আমি ব্যক্তিগতভাবে 'নাগরিকতা' এবং 'গ্রাম্যতা' বলতে যা বোঝায় তার দু'টিকেই অপছন্দ করি। আসলে তা নয়—কবিতা এবং সেই কবিতার পরিমণ্ডলটিই আমি ধরতে চাই। নির্মল নাগরিকতাকে ঘৃণা করলেও সে নিজে কিন্তু গ্রাম্য নয়।

(১) আমার শরীরে জেগে উঠলো গাছপালা—
প্রকৃতির স্নেহ

আমারই কাছে দৌড়ে আসছে ন্যাংটো বালক (আকাঙ্ক্ষা)

(২) একজন অন্ধ
বাঁশির ভিতর দিয়ে একটা জীবন
ছুঁয়ে যাবে আমাকে (এ-ই)

(৩) পুরোনো এ রক্ত আমাদের নয়
আমরা গান গেয়ে ধান কেটেছি কাল
আমরা গান গেয়ে ধান কেটেছি আজ, এ বাদে
বাকী সব পুরোনো
পুরোনো এ জীবন আমাদের নয় (পুরোনো এ জীবন আমাদের নয়)

(৪) একাকীত্বের পাশে
আমি ধূপ জেলে দিই, ধূপের ধোঁয়ায়
দিদি হারিয়ে যায়
আমি লক্ষ নিয়ে খুঁজতে থাকি (দিদি)

এরকম বহু স্তবক/পংক্তি তুলে বলা যায়, নির্মল কবিতার ভিতর থেকে তথাকথিত নাগরিকতা দ্বিধাহীনভাবে বর্জন করতে পেরেছে, কিন্তু কোথাও সে নিজে গ্রাম্য হয়ে পড়েনি। এখানেই নির্মলের জয় সুনিশ্চিত হয়েছে।

'পুরোনো এ জীবন···' তিনটি ভাগে বিভক্ত। 'বাস্ত' 'শ্রম' 'গান'। 'বাস্ত' অংশের নির্মলের মধ্যে চিরায়ত স্থিতি-কামনা, সংসার, প্রেয়সী, প্রেম, পারিবারিক জীবনের আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। সুন্দর, সহজ ভাবে যা আমাদের স্পর্শ করবে। 'শ্রম' অংশে নির্মল তার পরিচিত, অতি সুপরিচিত সমাজ জীবনের শ্রম ও উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের টুকরো টুকরো সুন্দর ছবি গড়ে তুলেছে, খুবই সহজ আন্তরিকতার সঙ্গে। তার প্রকাশভঙ্গি ও বিষয় নির্মাণ, শব্দ চয়ন ও বিষয়ের উপস্থাপনা অভিনব। একটা নতুন আন্তরিক স্বাদ পাওয়া যায়! শ্রমজীবী মানুষের দিকে তাকিয়ে উত্তমর্ণের রাজনৈতিক উদারতায় দেখা নয় তার কবিতা। শ্রম ও শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে লেখা বাংলা কবিতা কিছু পড়েছি, কিন্তু নির্মল সে রকম নয়। একেবারেই আশাতীত নতুন রকম দৃষ্টিভঙ্গী ও উপস্থাপনায় তার কবিতা শ্রম ও শ্রমজীবী জীবনকে ধরতে পেরেছে। বলাই বাহুল্য যে, এতে বাংলা কবিতা কিছুটা

উপকৃত হল। সম্ভবত, এই ধারা নির্মলের পরেও বহতা থেকে অনেক বেশ উন্নত ও প্রসারিত হয়ে বাংলা কবিতায় মরা গাঙে প্রাণ সঞ্চার করবে। পাঠকও বাংলা কবিতাকে চিনে নিতে পারবেন; তাঁদের ঐ অভিযোগের সামান্য কিছু জবাব নির্মল হালদার। 'গান' কে খুব বেশি 'শ্রম' থেকে আলাদা করা যায় না, যতটা 'বাস্তু' 'শ্রম' থেকে আলাদা, ততটা 'গান' নয়। তবু, 'গান'-এ 'ভাত গীত' ২ এবং ৩ বেশ চমৎকার লেখা। ভাত-কে নিয়ে গান। এই অংশের 'এসো' এবং 'সঙ্গীত' বেশ ভালো কবিতা।

আসলে নির্মল যা পেয়েছেন, তা হলো শ্রম ও শ্রমজীবী জীবন, নিজের গ্রামীণ, আধা-সামন্ততান্ত্রিক জীবনের পরিবেশ—এসব চমৎকার ভাবে তুলতে। তাকে কবিতায় স্থান দিতে। এর মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নেই। নেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উদারতা। পাতি-বুর্জোয়া উদারতায় এতকাল যা বানানো মনে হতো কবিতায়, নির্মলের হাতযশ ও বোধ-বুদ্ধির স্বচ্ছতা-আন্তরিকতায় তা অকৃত্রিম মনে হয়েছে। নির্মলের ভাষা যে শুধু মৌখিক ঝরঝরে ভাষা তাই-ই নয়, একটা বিশিষ্ট ভাষা-রীতিও বটে। হয়ত বিষয়ের অনুষঙ্গে এ ভাষা অজান্তেই গড়ে উঠেছে। আঙ্গিকও তাই, নিপাট, ঝরঝরে আঙ্গিক। হয়ত বিষয়ের প্রয়োজনে, উপস্থাপনার স্বার্থেই নির্মলের আঙ্গিক এরকম হতে পেরেছে। একটু গভীর ভাবে ভাবলে বেশ আশ্চর্যই হতে হয়। 'পুরোনো এ জীবন আমাদের নয়' থেকে—আমাদের অনেক কিছুই শেখার আছে দেখছি। অন্তত বিষয় ও আঙ্গিকের সেই চিরাচরিত তর্কের একটা সুন্দর জবাব হতে পারে নির্মলের এই কাব্য-গ্রন্থটি। নির্মলের কবিতাকে কি আমি লোকায়ত কবিতা বলতে পারি? 'অন্নের নীরবতা'র কনট্রাডিকশন থেকে ওঠে আসা সিনথেসিস হলো 'পুরোনো এ জীবন আমাদের নয়'। নির্মলের পরবর্তী বইটির জন্যে কৌতূহল রইল।

পুরোনো এ জীবন আমাদের নয় ☐ নির্মল হালদার ☐ শোণপাংশু ☐ ২৮/২ কাঁটাপুকুর লেন, হাওড়া-৭১১১০১ ☐ দাম : পাঁচ টাকা

অনুভব

যেহেতু নদীতে যাই ঘন ঘন
তাই
স্বপ্নের অনুষঙ্গে মাঝে মাঝে এসে যায় বালি

যে-বালি পায়ের নিচে শান্ত থাকে
কোনো প্রশ্রয় ছাড়া সেই-ই
এত ভারি হয়, হয়ে উঠতে চায়
আর সরাতে পারি না বলে
অকস্মাৎ মনে পড়ে জল

তবে কি বুঝিনি রাত্রি, দেহদান, নির্মাণ-কৌশল?
যে বুঝেছে রাত্রিকে এই কষ্ট তার জন্য নয়।

গহন

আমার সবুজ আঁতি শেষ হলে
শুরু হয় জঙ্গলের খেলা

জঙ্গল মানে তো জানি
গাছেদের গাঢ় ছুটোপুটি

সূক্ষ্ম কারুকাজ দেখে
স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে থাকা, থাকা

একে কী বলবি তুই, কী বলবি
তাও আছে জানা :

একলা কিশোরীকে পেলে
মুখ খোলে ঘনঘোর বন

অবস্থান

সৌরশাসনে থাকো, তাই তুমি সুন্দর হয়েছ,
সৌর নিয়ম ভেঙে
আমি করেছি তছনছ জীবনপ্রণালী

এ সময় নষ্ট হল ঘুম আর প্রতিশ্রুতি
হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে উড়ে গেল কিশোরীর ফিতে
নিজেকে পোড়াবার ব্যস্ত আয়োজনে
অনিদ্রার রাতগুলি দ্রুত গেঁজে মদ হয়ে গেল।

সঞ্জয় রায়

জননী

হে বন্ধ্যা গাছ, তোমারও দেবার মতো ভালোবাসা আছে—
তুমিও যে ভালোবাসতে পারো,
তা কেবল বলে দেয় তোমার নিষ্পত্র সরলতা।

যেন এক রোগদুষ্ট বালিকার ম্রিয়মান নীরব কৃশতা, চোখে পড়ে,
যার ছিলো জননী হবার মূক, অন্ধ ব্যাকুলতা।

আজ সেই শিশু, কিংবা পিতা কেউ নেই—
পৃথিবী এখন খুব অন্যরকম হয়ে গেছে, হে বন্ধ্যা গাছ।
তুমিই কেবল কিছু ভালোবাসা সন্তর্পণে দিয়ে যেতে পারো।
তোমার ভেতরে এক জননীর মুখ
রাত জেগে আছে—

যে আমায় বলেছিল, এই হাতে তুলে দেবে,
গাছের পিতার অধিকার।

ভালোবাসা বিষয়ে পদ্য

১

সভ্যতা থেকে সরে এসে দেখেছি তোমার দয়াময় প্রীতি
অদ্ভুত আঁধারে আঁধারে বীজধানের মোহরগুলি ছড়িয়েছো অনাহার-সমাজে
এই ভাবে মায়াময় খেলার ব্যস্ততায় হারিয়েছো নীলফুলের রাত ও দিন
হে দয়াময় নারী,
এবার তোল পরিত্যক্ত নির্বোধ এই ক্রীতদাস প্রেমিকের দিকে গোপন দুটি আঁখি।

২

ব্যর্থতার ভিতরে তুমি আলো নীল আলোখানি
আমি শুনি পাখিদের পালক পোশাক থেকে ঝরে পড়া—
আলোর মোহময় গানগুলি।
তোমার খুব কাছে ফিরে যাচ্ছি কোথায় যাবো?
আমার তো নেই নদীচরে ভালোবাসার নীল ঘরবাড়ি।

সৈয়দ সমিহুল আলম

বিরুদ্ধতা

কিছু কালো পায়রা ওড়ানো হ'ল
আর
পক্ষীতত্ত্ববিদ উঠে বসলেন কালো বিমানের ভেতর।

ঘোর আকাশ পেরিয়ে, পানাসক্ত চোখের চাঁদ পেরিয়ে
মাইল মাইল দূরে উড়ে চললো পায়রা
উড়তে থাকলো বিমান
তখন মধ্যরাত ; ভেসে উঠলো পৃথিবীর পায়রার
সম্মিলিত গান

তখন মধ্যরাত ; মাংসভুক পক্ষীতত্ত্ববিদ
মুচড়ে ধরলেন পায়রার কালো মাথা।

দিব্য মুখোপাধ্যায়

নিউট্রনযুগ

কথা ছিল, পৃথিবীর যত ঘাস ধান হয়ে ফিরে যাবে গঞ্জ গোলাঘরে
গোলমাথা টেকো চাষী প্রতিদিন হিসেব মেলাবে বসে কমপিউটারে

মাধুরী রকেটে চড়ে প্রীতি হনিমুন করব আমরা চাঁদের হোটেলে
কথা ছিল, অনন্তের কোলে পিঠে ধীরে ধীরে বড় হবে আমাদেরই ছেলে

অথচ হঠাৎ আজ চোখ মেলে চেয়ে দেখি, ঘটে যায় যে কথা ছিল না
শূন্য থেকে দুলতে দুলতে ভেসে আসে অতি নিবিকার এক আণবিক বোমা !

পিকনিক পার্টি

বিলুপ্ত প্রান্তরের কাছে ফিরে এলে তোমরা কোন অভিযাত্রী দল ?

প্রকাণ্ড কাঠের দরজা খুলে গেছে। এখন মধ্যদুপুরে সেই দরজা ঠেলে ঢুকে প'ড়ে
একদল মানুষ গাইছে আনন্দ-কোরাস আর খুলছে বীয়ারের ছিপি।

তিনজন অপ্সরী ফিস্‌ফিস্ স্বরে কথা বলছে। গুপ্তরহস্যের কথা।
অনতিদূরে
কালোকোলো ছেলে। অম্লকূটের গন্ধে তার চোখে নক্ষত্রের ঝিলিক।

ভাঙ্গা মন্দিরকে প্রদক্ষিণ করছে ক'জন ছোকরা। রাজা-মহারাজাদের স্থাপত্য।
প্রত্নবস্তু। মরচে পড়া লোহার ঘণ্টায় মাকড়সার জাল। সপ্তদশ শতাব্দীতে
যে চাতালে পুরোহিত বেদান্ত পাঠ করতেন সেখানে বসে ওরা জিরোয়।
মধ্যাহ্নকালে কড়া তামাকের গন্ধ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে হাওয়ায়।

ভাঙ্গা বীয়ারের বোতল, এঁটো কলাপাতা আর কোলাহলমুখর গানের রেশে
মাদার গাছের সারি আর নিবিড়তা পেরিয়ে বিকেলের পীতাভ আলোয়
এরা ফের ফিরে যাবে নিশ্চেতনা ও ভিনগ্রহের ধূ ধূ আঁধারির দিকে।

একটা কুকুর ছুটতে থাকবে ধুলো উড়োনো ট্যুরিষ্ট বাসটার পেছনে।

পরিত্যক্ত মন্দিরে ঘণ্টা বেজে উঠবে। প্রকাণ্ড কাঠের দরজা বন্ধ হয়ে আসবে।

বৃন্দাবন দাস

বাজার

এভাবে কবিতা লেখা যায় ?

কবিতার জন্য আলাদা শব্দ, আলাদা ভাষা
আলাদা ভাবনা-চিন্তা
আলাদা আদল

প্রতিদিন তর্ক চলে বাড়ি জুড়ে
ডালের দাম বাড়ছে, তেলের দাম বাড়ছে
তরিতরকারীর তো কথাই নেই
বাজারওয়ালী মেয়েগুনোর কী দেমাক
বলে 'নাও তো নাও, না নাও মেলা বকিয়ো না,
অনেক খদ্দের আছে'

বুঝতে পারি না
এদের এতো খদ্দের আসে কোথা থেকে
আমরা তো সবাই চাষা-মজুর, বড়জোর
একটু কেরানী

অথচ কেউ প্রতিবাদ করি না
না দাদারা না আমরা

অজিত বাইরী

ঘর বাঁধবে বলে

ঝকঝকে রোদ উঠবে বলে,
ক'টা দিন
মেঘ ভারি হয়ে আছে সকালবেলা।

আকাশের দেয়াল চিরে
হরিণের শিঙের মতো
উঠে গেছে শিল্পী ডালপালা
রক্ত-রঙের ফুল ফোটাবে বলে।

আর
ভালোবাসা ঘর বাঁধবে বলে,
পাখির ঠোঁটে
ডিম-ফোটা খোসার মতো ঝুলে আছে চাঁদ।

প্রমোদ বসু

হারিয়ে যাচ্ছি

হারিয়ে যাচ্ছি কেবল অবচেতনায়,
ব্যর্থ হাহাকারে।
পা জড়িয়ে ধরে মায়া, মায়ার হেঁশেল।
হারিয়ে যাচ্ছি শুধু নষ্ট চিতার পাশে
অবিকল, অদ্ভুত ধোঁয়ায়।

কেন হাহাকার ? কেন এই বাঁচার কৌশল ?
কেন এই লিপিকুশলতা ?
আমাকে আশ্রয় দেবে কতদূরে, অমোঘ কৌতুক ?

আমাকে পাথরে ভাঙে বাঁচার ক্ষমতা।

পিনাকী প্রসাদ ধর

নবেন্দু, তোমার বাড়ি

নবেন্দু, তোমার বাড়ি যেতে বড়ো দীর্ঘ, ঘুরপথ।

চাঁদমারি তীরে বিঁধে যাওয়া নয় ;
ভেসে ফেরা উড়ুক্কু হাওয়ায়···
অথচ বাড়ির ছাদ,—তোমার উঠোন, গাছতলা
চোখের অনতিদূরে,—ব'লে দেয়।

তারপরে আমার উধাও ছাদ থেকে
তোমার ঘরের অবয়ব ;
শিশু কোলে নারী, জল,
রেকর্ডপ্লেয়ারে ঘোরে গান···
বারান্দায় বুশিবল, চৌকাঠে গূঢ় কারুকাজ···

নবেন্দু, তোমার বাড়ি কেন তবু এতো দূর লাগে ··

দায়িত্ব

তোমার দেখার শুধু স্থির চোখে ভেসে থাকা স্রোতে।
স্রোতের ভিতরে যেই স্রোত থাকে তার কোনো কথা
জানার রোমাঞ্চ নয় ; ছুঁয়ে-দেখা-অস্থিরতা নয়।
তিরতির জল,—শুধু তাই,—সে কি জলের অধিক ?

তোমার পাখিকে বলো—সে থাক নিভৃতে, শেষ ডালে।
আরেক স্পর্শ কোথা বাহিরে কি দূরে ঘুরে উড়ে
আকাশে অদৃশ্য ডালে ডানা-ভর'—উড়ে যাওয়া শেখে :
যাক্ সে অনেক দেশে, রঙীন পাখির ডালে উড়ে ;

ফল থেকে ফল থেকে,— অরণ্যে, গভীর জনতায়,
ব্যাধের তীরের মুখে উড়ে উড়ে, পড়ন্ত বিকেলে ধূলিস্নানে,—
জীবনের বিশুষ্ক বাতাসে তার স্বর্ণাভ শরীর ধুয়ে যাবে।

অন্য যেই পাখি সে'ও ঐ পাখিরই,— অথবা সুদূর···
ঘটনার কেন্দ্রে,—তবু ধুলোওঠা ঘূর্ণীঝড়ে নেই,
টানটান ধনুকের ছিলা নয়,. শরীরে মাথে না আর তাপ
অথবা বুকের মাটি কেঁপে ওঠা,—কোথায় কিভাবে, তাই ভেবে ;
তার শাদা রং যেন আকাশেরই দ্বিতীয় বিস্তার,—
স্থস্থির ডানায় ভাসে নিভৃতে ডালের কাছে থেকে।

জীবনের গভীর আকাশে, স্রোতে, ভেসে থাকা,—এই,—শুধু এই ?
স্রোতের ভিতরে থেকে নেই,—নাকি নিজেই সে স্রোত ?
জেগে থেকে মাছ, পাখি, কেবলি ঘুমের,—ঘোরে ফেরে,·····
তোমার দায়িত্ব শুধু—অন্তহীন—একা জেগে থাকা।

সত্য বিশ্বাস

কঠিন সময়ঃ দারুণ চৈত্র মাস

কঠিন সময় আজ দারুণ আগুন চৈত্রমাস
ঘামের আয়নায় ভাসে যুবতীর গালের রক্তাভা
ঝলসানো মুখে তার লজ্জার রঙের মরীচিকা—
কুসুমের মাস ? নাকি সব পুড়ে একাকার দহনের কালে।

কঠিন সময় তাই গলা পীচে সপ্তপদী হেঁটে
অফিস পাড়ায় ঘোরে চৈত্রের উজ্জ্বল পসারিণী
অচেনা যুবাকে বলে ঃ 'দেখুন নতুন সেভিং সেট',
কোম্পানীর প্রতিনিধি—রাঙামুখে আত্ম উন্মোচন
'সেফ্‌টি রেজর দেখুন, ধারালো অব্যর্থ হাল্কা দ্রুত
আজকের অবকাশহীনতার মাপে মাপে গড়া।'

কঠিন সময় আজ অথচ অমোঘ চৈত্রমাস।

আমার স্মৃতি

পূর্ব জন্মের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে আমার স্মৃতি
চারিদিকে নেমে আসে নিজস্ব অন্ধকার, অসুখ,
এই হিমঘরের পৃথিবী ও তার শীতের পোষাক খুলে
কোথাও যেতে পারি না ; আর তাই যেন
বিষাদ এসে ছুঁয়েছে দুই পা ; আমি
জলের মধ্যে জলের মতন ছুটে যেতে যেতে হঠাৎ
শুনতে পাই বাঁশীর শব্দ ; কে বাজায় ?
অবেলার ফুল ছুঁয়ে কেঁদে ওঠে এই নগর সভ্যতা
আমাকে আত্মহত্যা করতে বোলোনা হে পাখি
এই ছাখো, আমারো মুখে আছে কিছু খড়কুটো
কোথাও যদি হাঁস কিংবা হাসির স্রোতে ফিরে পাই
আমার সেই স্বপ্নময় হারানো কৈশোর
দেখো, আমিও তুলবো ঘর, থাকবে অনন্ত বারান্দা;
দেখো, পিঁড়ির উপর বসে থাকবে একজন ঋষি
যার বয়স তিনলক্ষ বছর
পূর্ব জন্মের দিকে তাকিয়ে আছে আমার স্মৃতি ও রক্ত
আমাকে শুনিও না আর কুয়াশার ব্যর্থতার কথা।

আমার অভিমান ছুঁয়ে

একদিন ভাঙা দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে মনে পড়বে আমার কথা ;
জন্ম থেকে হেঁটে আসছি দুঃখ আমার অনন্ত পরিত্রাতা
কোনো বটবৃক্ষ পাইনি সমস্ত জীবন, যার ছায়ায়
দু-দণ্ড দাঁড়াব। মাঝে মাঝে
জেগে ওঠে পিপাসার মূল, নিজস্ব গড়ে তোলা এই হিমশীত
এই শিল্প এই বারান্দাহীন এক বিশাল অন্ধকার
আমি যেন এক শিশু, মা'র স্তন চুষছি আর চুষছি অথচ

এখনো বড়ো হইনি। আমার দিকে
তাকিয়ে আছে মুগ্ধ জনজীবন, কিছু আলাদা রোদ জলছায়া,
আমি কথা বলবো কার সঙ্গে ?
একদিন ভাঙা দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে ইচ্ছে হবে খুউব
আমায় চেঁচিয়ে ডাকতে ; আমি ঘরের ভিতর থেকে
তখন শুনব। সাড়া দেবো না ; আমার
অভিমান ছুঁয়ে তোমাকে যেতে হবে ঠিক ততোদূর
যতোদূরে যায় শাঁখের শব্দ স্রোত—

স্বপ্নে যাদুঘরে

এভাবেই ভেবে যাবো প্রথমে জমির কথা, তারপর ঘর।
তারপর সংসার সন্তান সন্ততির কথা। এভাবেই।
আমার ভালো লাগে না হাতীর গল্প ; আমার
ভালো লাগেনা শৃগালের কাহিনী ; তবু যদি কখনো
হে সন্তান আমার, তুমি শুনতে চাও তাদেরই বৃত্তান্ত
আমি প্রাণভরে রাতের অন্ধকারে তোমাকে তা শোনাব।
দেখেছি মিথ্যে পথের ওপর দ্রুত খেলা চলে রক্তের ;
কেউ যেন কাউকে ভালোবাসার কথা বলতে চায়
আর তক্ষুনি আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে,
কেউ যেন গোপন শব্দ খোঁজে হৃদয়ের ঘরে বাইরে
অমনি পৃথিবী পা তুলে ছন্দহীন নাচে,
—এইসব দেখেছি আমি স্বপ্নে, যাদুঘরে।
অথচ যাদুকর নই আমি, মানুষ বটে। আমিও জানি
নদী শব্দটি দু-অক্ষরের আর পাহাড় তিন
আমিও জানি, যে মানুষ মৃত, সে আর শ্মশান থেকে
ফেরেনা বাড়ী, তবুও জীবন ছড়ায় গাছ থেকে ফলে ;
এভাবেই ভেবে যাবো, শুধু ভেবে যাবো। আর মাঝে মাঝে
চোখ তুলে বলে উঠবো
—হায় জন্ম হায় অনুতাপ

বাবার সঙ্গে

সেই লোকটা ছিল, যে এইমাত্র ব্লাডব্যাঙ্কে রক্ত দিয়ে
খুউব বিষণ্ণ। আমার ভাব নেই তার সঙ্গে। তাই
তার সাথে কথা বলার ইচ্ছা মনে পুষে রাখি ;
সেই লোকটা ছিল, যে মুঠিতে বাজায় ডুগডুগি আর
বানর নাচে আশ্চর্য পয়সার প্রক্রিয়ায়
সেই লোকটা ছিল, খুউব বিষণ্ণ। আমি
তাকে ছুঁইনা, তার পাশের বয়ে যাওয়া বাতাস ছুঁই ;
সে যতোটুকু রোদে দাঁড়িয়ে আমিও সেটুকু নিই ধোরে।
এইবার ক্লান্তিতে লোকটা আমার দিকে যদি চোখ ফেরায়
আমি নিশ্চয় তাকে ডেকে উঠবো
—বাবা

আমার ভাব নেই তার সাথে। আজ সে আমায় দেয়নি
বিস্কুট কেনার পয়সা !

আশ্চর্য আকাশ

আমার হাত ধরে আছো কেন ? আমি প্রেমিক নই তোমার ;
মৃত্যুর চারপাশে ঘুরে আসে কিছু স্মৃতি কিছু জন্মতাপ
মেঘ হয়, বৃষ্টি হয়, অসুখ নিয়ে কাঁদে হাসপাতাল,
দোর বন্ধ দেখে ফিরে যায় একদিন সভ্যতার রথ
আমি সেসবের কিচ্ছু জানি না। তুমি এবার অন্যদিকে
যাও। আমার পাশ থেকে সরে অন্য কথা ভাবো।
আমি চাই, তুমি জীবন ছুঁয়ে সেতার বাজাও আর
চারিদিকে উড়িয়ে দাও গাছের পাতা যা স্বপ্নময়।
বাল্মীকির ছিল উঁইঢিবি। তোমার কি আছে ?
আমার হাত ধরে আছো কেন ? শিল্প এইরকম নয়।
যদি জাগে মায়াবী চিতা এক বুকের বন্ধ খাঁচায়
যদি ছাখো বিদ্যুৎলতার মতো উঠে আসছে আলপথ

যদি বোঝো ধান হচ্ছে মানুষের আসল শৈশব
আমি তবে তোমার জন্য ঠিক চোখের জল ফেলব।
আমি শপথ নিচ্ছি। কিন্তু ছাড়ো, হাত ছেড়ে দাও।
হাত ধরে রাখলে আমার নিজেকে খুউব পরাধীন লাগে—
আমাকে থাকতে দাও আমার মতো
তুমি গড়ে নাও আশ্চর্য আকাশ
যা দূর থেকে নীল মনে হয়, অথচ ঠিক নীল নয়।

সুভদ্রা ভট্টাচার্য্য

পাথরের চোখ

কোথায় গেলো আমার সেই চোখ
সেই দেখার চোখ
সেই কৈশোরের সঙ্গীময় খেলা
অথবা
যৌবনবয়সের সেইসব সঙ্গী
যারা মনে করিয়ে দিয়েছিলো আমার চোখ আছে

আর আজ……
পাথরের চোখ বেয়ে নেমে আসছে
অসম্ভব একটা কান্না
আমার ভালোবাসা হারানোর চাপা দীর্ঘশ্বাস

তুমি বলেছিলে আমাকে অনেক রোদ এনে দেবে
এনে দেবে অনেক সুখের গল্প
অথচ টানা ঝুলবারান্দায় আমার চোখ
বিষণ্ণ পাথরের মতো শুধু মাথা খোঁড়ে

আমার চোখ এখন পাথরের
দেখার মতো আর তাই কিছুই নেই।

একটি পাগল সাঁকো নাড়ে

১

উড়িয়ে দিলাম ভালোবাসা শঙ্খচিলের পাখ্‌না,
দু'টি মানুষ আশায়-আশায় দুঃখ কিছু পাক-না…
নিবিড় ছিলো দু'টি চোখের সুখের বেলোয়ারী—
এখন শুধু নীল দিগন্ত খাঁ-খাঁ বালিয়াড়ি।

মানুষ ক্রমে হিংস্র হ'চ্ছে
হিংস্র হ'চ্ছে শহর
ভাঙ্‌ছে গৃহ, ভাঙ্‌ছে মানুষ
টুক্‌রো টুক্‌রো ডহর।

করায়ত্ত ছিলো সেদিন মাটি এবং আকাশ
দু'টি মানুষ দু'দিকে যায় দুইদিকেতে বিকাশ।

২

শব্দ থেকে শব্দে ছু'টে যাচ্ছে স্খল
অবহেলায় বহে যাচ্ছে জল
এখন কে দেবে বাঁধ ?

কথা থেকে কথা ছড়িয়ে পড়ে
একটি পাগল সাঁকো নাড়ে
আকাশে ঝোলে দৈবী এক চাঁদ।
তৃষ্ণা আমার মধ্যযামে,
বক্ষ জুড়ে—
তৃষ্ণা আমার নিজ ভ্রমে
অন্তঃপুরে—

ক্লিশিত এই তপ্ত বুকে ব্রহ্মনাদ।

গন্ধ নিয়ে

মাঝে মাঝে অমৃতলোকের গন্ধ আসে

কতো পার্থিব গন্ধের মধ্যে ডুবে থাকি
তেলেভাজার গন্ধে ভরপুর হয়ে যায় বিকেল
স্নো-পাউডার রুজ-লিপস্টিকের শারীরিক গন্ধ
খরমুজের হাল্কা কাঁঠালী চাঁপার তীব্র স্যাণের সৌরভ বিরিয়ানির খুসবু
ডাষ্টবিন-নালা-নর্দমার পচাগন্ধ ছাপিয়ে মাংসের চপ ভাজা হয়
পৃথিবীময় পচামাংসের চপ

তবু মেটেরঙের টিলা হঠাৎ জাগ্রত বসন্তের মতো
সবুজরঙের সেন্ট ছিটিয়ে কেমন ইন্টিমেট হয়ে ওঠে
আর আমরা সাধারণকে পেতে মেতে উঠি প্রিয় ব্যবহারে

কবিতা-প্রিয় নাগরিক কবিতার মধ্যে সঙ্গীত প্রিয় প্রিয় লোকসঙ্গীতের মধ্যে
নেশাগ্রস্ত গ্রস্তশরীর বিলিয়ে দিতে শরীরকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যায়
খোঁপায় বেলফুলের মালা বা একটি গোলাপ কতো অসাধারণ হয়ে ওঠে
সমস্ত ছাপিয়ে যখন অমৃতলোকের গন্ধ আসে
সমস্ত বাসনা ছেড়ে মানুষ সমুদ্রের দিকের জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে একা
কোনো সমুদ্র-নৌকো আকাশ নক্ষত্র থেকে কোনো আলো
আর তার চোখে পড়ে না আর ঢেউ নয় রঙ নয় শব্দ নয়
একমাত্র গন্ধ তাকে বুঁদ করে রাখে

হাতের তালুতে যখন গন্ধ পাওয়া যায়
বালিকা বাজিয়ে যায় তুমুল খুশীর ম্যারাকাস
সেই গন্ধে গভীর প্রবাস

কবিতার ভাষা, বাংলা কবিতা

১.

কবিতার ভাষা কি মুখের ভাষা থেকে আলাদা? কিংবা কবিতার ভাষা কি লিখিত গদ্যের ভাষা থেকে আলাদা? যে-কোনো মানুষই সহজবুদ্ধিতে এ দুটি প্রশ্নের যে-উত্তর ভেবে নেবেন সেটাই সংগত উত্তর। হ্যাঁ, কবিতার ভাষা মুখের ভাষা থেকেও আলাদা, আবার লিখিত গদ্যের ভাষা থেকেও আলাদা। আমাদের অভিজ্ঞতা, সংস্কার এবং বিচার সব দিক থেকেই আমরা ওই এক উত্তরে পৌঁছে যাই। কিন্তু তার পরেই আরো দুটি প্রশ্ন উঠে পড়ে! এক, কবিতার ভাষা বাকি ঐ দুটি ভাষা থেকে কেন আলাদা; এবং দুই, কীভাবে আলাদা হয়ে যায় কবিতার ভাষা, কোন্ কোন্ বিশেষ প্রকরণ-প্রক্রিয়ায় কবির ভাষাব্যবহার সরে আসে সাধারণ মানুষের মৌখিক ভাষা কিংবা গদ্যলেখকের কলমের ভাষা থেকে? আমরা এই দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রথমে এ নিয়ে একটু তাত্ত্বিক আলোচনা করব, তার পরে বাংলা কবিতার ভাষার ধারাবাহিক রূপ থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে ঐ পার্থক্যের সূত্রগুলি দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করব।

এই প্রসঙ্গে এমন কথা উঠতে পারে যে, হ্যাঁ, এক সময় কবিতার ভাষা মুখের ভাষা বা লিখিত গদ্যের ভাষা থেকে আলাদা ছিল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এখন কি তা খুব বেশি আলাদা? এখন তো আমরা মুখের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে এসেছি কাব্যভাষাকে, লিখছি 'গদ্য'-কবিতা—এখনও কি খুবা প্রবলভাবে বলা সম্ভব যে এ ভাষাগুলির মধ্যে দূরত্ব আছে? বুদ্ধদেব বসু 'দময়ন্তী' কবিতাগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৯৪৩) বইয়ের শেষে একটি গদ্যকথন যোগ করেছিলেন। পরে পরিত্যক্ত এই রচনাটিতে তিনি জানাচ্ছেন যে, তাঁর সংকল্প ছিল, কবিতা রচনার সময় 'বাক্যবিন্যাসের মৌখিক রীতি থেকে চ্যুত' হবেন না তিনি, সাধু ক্রিয়াপদ 'হইব' 'বলিব' ইত্যাদি এবং কাব্যিক ক্রিয়াপদ 'ফুটি,' 'চলিছে,' কাব্যিক শব্দ 'মম,' 'কভু,' 'যেথা', 'নারি,' ইত্যাদি তিনি সম্পূর্ণ বর্জন করবেন। তবু লক্ষ করি, তাঁর উদ্দেশ্য কবিতার ভাষাকে মুখের ভাষার সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ ঐক্য দেওয়া কখনোই নয়। তিনি প্রথমত ছন্দ রক্ষা করার কথা ভাবছেন, প্রশ্ন তুলছেন 'বাক্‌রীতির সঙ্গে কাব্যরীতির মিলনের শ্রেষ্ঠ বাহন

কোন ছন্দ?' তাঁর মতে পয়ার ছন্দই সেই উত্তম বাহন, তার পরেই ছড়ার ছন্দ। দ্বিতীয়ত, বাংলার 'মেয়েলি' (feminine), অর্থাৎ দু-সিলেব্‌লের মিলকে পরিহার করে এক সিলেব্‌লের—'বুদ্ধিতে/দিতে'-র বদলে 'ঝুঁকে/ডাকে'-র মিল—তাঁর পছন্দ, যদিও দ্বিতীয় ধরনের মিল তিনি যে শেষ পর্যন্ত খুব বেশি ব্যবহার করে উঠতে পেরেছেন তা নয়, আর বাঙালি কবিরাও খুব ব্যাপকভাবে এ সুপারিশ গ্রহণ করেছেন পরে, তাও চোখে পড়ে না। তবু কবিতার মিল সেই মুহূর্তে সম্পূর্ণ বর্জনের পক্ষপাতী নন বুদ্ধদেব বসু, পরে যদিও গদ্যকবিতা লিখেছেন তিনি। তৃতীয়ত, 'রতি-হ্রস্ব' বা 'স্বতঃ শ্লথ' গোছের তৎসম ব্যবহারে তাঁর আপত্তি নেই, কারণ তাঁর কাম্য, "ভাষা হবে সুগম্ভীর সাংস্কৃতিক"; তাঁর যুক্তি, "সংস্কৃত শব্দ বেশি করে নিলে রচনায় যে দৃঢ়তা ও সংহতি আসে সেটা ছাড়বো কেন?" ফলে আমরা লক্ষ করছি, কবিতার ভাষাকে মুখের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে আসার পক্ষে সবচেয়ে বড়ো 'আধুনিক' উকিল যিনি, তিনি অন্তত তিন দিক থেকে এ দুয়ের অল্পবিস্তর দূরত্ব রক্ষা করতে চান—ছন্দ, মিল বজায় রেখে এবং সাধারণভাবে অব্যবহৃত তৎসম শব্দ প্রয়োগের স্বাধীনতা দাবি করে।

বলা বাহুল্য, গদ্যছন্দের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের ব্যগ্র ক্রুসেডের কথাও এখানে স্মরণ করতে হবে। 'পুনশ্চ' (১৯৩২) বইয়ের কবিতাগুলি লেখার আগে ও পরে তিনি গদ্য ও পদ্যের ব্যবহারিক তফাত, সৌন্দর্যগত এবং আবেদনগত বিভিন্নতা, অভিজ্ঞতার স্তরভেদ ইত্যাদি নিয়ে চিঠিতে বক্তৃতায় রচনায় কী বিপুল শোরগোল তুলেছিলেন তা অনেকেরই জানা। প্রবোধচন্দ্র সেনের সাক্ষ্য অনুসারে ১৯৩২-এর জুলাই থেকে ১৯৪০-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে মনোযোগের বিস্তার চোখে পড়ে, যদিও 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫), 'পত্রপুট' (১৯৩৬) এবং 'শ্যামলী' (১৯৩৬)-তে সর্বাঙ্গীণ-ভাবে এবং 'আকাশ-প্রদীপ' (১৯৩৯), 'নবজাতক' (১৯৪০) ও 'সানাই' (১৯৪০)-এ একটি-দুটি করে গদ্যকবিতা যোগ করার পাশাপাশি অজস্র মিলও ছন্দের কবিতা লিখেছেন তিনি, সেটা তাঁর শেষ দশ বছরের কবিতার তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে তিনি দাবি করছেন 'পুনশ্চ'-এর কবিতাগুলি 'পদ্য' নয়, তবে নিছক গদ্যও নয়, 'রূপরসাত্মক গদ্য'। অন্যত্র তাঁকে বলতে দেখি, "ভাষার কক্ষে অনতিভূষিত গৃহস্থালি গদ্য হলেও তাকে সম্পূর্ণ গদ্য বলা চলবে না, যেমন চলবে না আপিসঘরের অসজ্জাকে অন্তঃপুরের

সরল শোভনতার সঙ্গে তুলনা করা। আপিসঘরের ছন্দটা প্রত্যক্ষই ব্যঞ্জিত, অন্যত্র ছন্দটা নিগূঢ় মর্মগত, বাহ্য ভাষায় নয়, অন্তরের ভাবে।" তার পরেও তিনি লিখিত বা মৌখিক গদ্যের সঙ্গে তাঁর কবিতার গদ্যভাষার তফাত নির্দেশ করেছেন, "অধুনা 'শেষসপ্তক' প্রভৃতি গ্রন্থে আমি যে ভাষা, ছন্দ প্রয়োগ করেছি তাকে 'গদ্য' বিশেষণে অভিহিত করা হয়েছে। গদ্যের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে বলে কেউ কেউ তাকে বলেছেন গদ্যকাব্য, সোনার পাথরবাটি। আমি বলি, যাকে সচরাচর আমরা গদ্য বলে থাকি সেটা আর আমার আধুনিক কাব্যের ভাষা এক নয়, তার একটা বিশেষত্ব আছে যাতে সেটা কাব্যের বাহন হতে পারে; সে ভাষায় ও ভঙ্গিতে কোনো সাপ্তাহিক পত্রিকা লিখিত হলে তার গ্রাহক সংখ্যা কমবেই, বাড়বে না।" এবং এই প্রসঙ্গে অন্যত্র তিনি দেখিয়েছেন যে, তাঁর কবিতার গদ্যভাষা বুদ্ধিপ্রধান নয়, রসবোধ-সূচক। তাতে একটা "প্রচ্ছন্ন আবেগের ব্যঞ্জনা," একটা "ভাববিন্যাসের শিল্প" আছে। কেজো গদ্যে তা নেই।

দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ এবং বুদ্ধদেব বসু দুজনেই কবিতার ভাষা যে দৈনন্দিন বাগ্‌রীতি এবং প্রচলিত গদ্যের কাছাকাছি এসেও পৃথক থাকে, এ সম্বন্ধে সতর্ক ছিলেন এবং সে-পার্থক্য নির্দেশে যত্ন নিয়েছেন। গদ্যকবিতার ভাষাও মৌখিক ভাষা এবং লেখ্য গদ্য থেকে দূরবর্তী। এমন-কী যে-কবিতা গদ্যের আকারে, লাইন না ভেঙে পাতা জুড়ে লেখা হয়, সাধারণ গদ্য থেকে তার দূরত্বও আমাদের চোখে না-পড়ে পারে না। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'-র অনেক কবিতায়, কিংবা অরুণ মিত্রের এই পঙ্‌ক্তিগুলিতে—

ছেলেবেলায় আমরা শীতের সকালে হি হি করতাম। পাঁচিলটা রোদ আটকাত। তখন আমি মনে মনে এক তীক্ষ্ণ জেরার সামনে প'ড়ে যেতাম। কেবল প্রশ্ন। কেন এখানে এই পাঁচিল তোলা হয়েছে, কেন এটাকে কেউ ভাঙছে না, ইত্যাদি। অতশত কেনর উত্তর আমার জানা ছিল না। সেজন্যে এক রকমের কষ্ট হত। তবে আসল কষ্ট ছিল শরীরের। যেখানে তাপ খুঁজছি সেখানে তাপ নেই। আমাকে এবং আমার সঙ্গীদের পেছনে হটতে হত। একেবারে পেছনে, যে জায়গায় তেরছা একটু রোদ এসে পড়ত। সেটা একটা সামান্য। তারপর আর সরা চলে না। তারপর খাদ। আমরা তারই ধার বরাবর বসতাম। এ তো ভারী অদ্ভুত অবস্থা, আমি ভাবতাম, ও পাশে পাঁচিল আর এ পাশে খাদ; তাহলে আমরা কোথায় আছি? [শীতের সকালে]

এ উদ্ধৃতি একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে আমরা বুঝতে পারছি যে, এতে আবেগ লুকোবার একটি সজ্ঞান চেষ্টা আছে, এবং উচ্চারণও বিশেষভাবেই কথ্য ও লৌকিক। তা সত্ত্বেও এর মধ্যবর্তী আবেগের মৃদু তাপ এবং প্রতীক-নির্মাণের সহজ চেষ্টাটি একে মুখের ভাষা থেকে স্পষ্টতই আলাদা করে দেয়, আলাদা করে কেজো গদ্য থেকেও। আমরা কবিতা ও মৌখিক ভাষার প্রাথমিক তফাতগুলির কথা নাইবা তুললাম। এ তো সকলেই জানে যে, মুখের ভাষা বিষয়বদ্ধ কিন্তু বিষয়ের আলোচনায় তা সংহত ও structured নয়, কবিতার মতো তার আরম্ভ, বিস্তার ও শেষ নেই, কবিতার মতো তাতে শব্দ, শব্দহীনতা, ছন্দ ইত্যাদি নির্বাচন করার সতর্কতাও নেই। কবিতার লাইন যে সচরাচর গদ্যের লাইনের চেয়ে অনেক ছোটো, পাতার ডানদিকে খানিকটা শাদা জায়গা যে বাকি থেকে যায়, এবং আবৃত্তি করতে গেলেও যে কবিতার প্রতিটি পঙ্‌ক্তির শেষে সাধারণভাবে একটু থামতে হয় কমা-দাঁড়ি-সেমিকোলনের সংকেত ছাড়াই, এতেই বোঝা যায় কবিতা শব্দহীনতাকে খুব পরিকল্পিত-ভাবে ব্যবহার করে, মুখের ভাষা কখনোই এমন ভাবে করে না। অর্থাৎ প্রয়োগে মৌখিক বাগ্‌রীতির খুব কাছাকাছি এসেও, গদ্যের বহিরঙ্গ মেনে নিয়েও, কবিতার ভাষা মুখের ভাষা থেকে খানিকটা ব্যবধান সবসময়ে রক্ষা করে। ব্যবধান রক্ষা করে ব্যবহারিক লিখিত গদ্য থেকেও, কারণ কেজো গদ্যের বিন্যাসে যুক্তির পরম্পরা ও বিস্তার থাকে, বক্তব্যের প্রসঙ্গ-নির্দিষ্ট একটা শৃঙ্খল থাকে, কবিতায় তা থাকে না।

গদ্যকবিতার ভাষারই যদি এই আচরণ হয়, ছন্দোবদ্ধ প্রথানির্ভর কবিতার ভাষা সম্বন্ধে বেশি বলা বাহুল্য মাত্র। তা খুব স্পষ্ট এবং নিরূপিত ভাবেই আলাদা। আমরা লক্ষ করব, ভাষার যে-কটি স্তর (level) আছে, সব ক-টিতেই কবিতার পরিচিত ভাষা আলাদা হওয়ার চেষ্টা করে এসেছে। পরবর্তী অংশে, শুধু ছন্দের কবিতা আলোচনা করে, আমরা এই বিভিন্নতার প্রতিটি স্তর লক্ষ করব।

২.

প্রথমে ধরা যাক ধ্বনি' বা sound-এর স্তর। মুখের ভাষা, এমন-কী লিখিত গদ্যভাষার শব্দের ধ্বনিবিন্যাস কে কবিতায় একটু-আধটু অদলবদল করা হয়। এমন কথা বলার দরকার নেই যে, কবিতায় কেবল শ্রুতিসুখকর ধ্বনির বিন্যাস করতে হবে, যদিও একসময় স্পষ্ট শ্রবণরঞ্জন ধ্বনির বিন্যাস কাব্যভাষার

অন্যতম শর্ত ছিল, সিসেরো (cicero) থেকে ভারতচন্দ্র অনেকেই বলে গেছেন। এই সাজানো ধ্বনির অভিঘাতে কবিতার ভাষা আলাদা হয়ে যায়, এ কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। এই অভিঘাত যে মূলত দু-ধরনের, তাও স্পষ্ট। কখনো কখনো একই ধ্বনি বা অক্ষর বা তার চেয়ে বড়ো ধ্বনি-ইউনিটের পুনরাবৃত্তির ফলে শ্রুতি-সুভগতার সৃষ্টি হয়। এ হল ধ্বনির সংগতিময় বিন্যাস, যার পরিচিত উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের 'চল-চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ' কিংবা একাধিক ধ্বনির পুনরাবর্তনে আরেকটু জটিল উদাহরণ, গ্রীস্টোফার মারলোর—'Melodious birds sing madrigals.' ধ্বনির বিসংগতির বিন্যাসও আছে, যেখানে পাশাপাশি নানা বিষমজাতের ধ্বনিকে সাজিয়ে সংগতি ভাঙবার সচেতন চেষ্টা থাকে, তাতে আবার অন্যধরনের, এবং জটিলতর ও আরো তৃপ্তিদায়ক, শ্রুতিসন্তোষের সৃষ্টি হয়। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের "কেকাধ্বনি" ('বিচিত্র প্রবন্ধ') পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই অনুধাবন করেছেন যে, অতিনিয়মিত অতিনিরূপিত ধ্বনি-সংগতির চেয়ে, অনুপ্রাসের বর্তমানে ঠুনকো-হয়ে-আসা নিক্কণের চেয়ে, বিসংগতিময় ধ্বনিবিন্যাস কবিতাকে অনেক বেশি সম্ভ্রম দেয়।

কবিতার ভাষা নৈঃশব্দ্যকে ব্যবহার করে যে-জায়গায় সবচেয়ে বেশি ক'রে, তার নাম ছন্দ। ছন্দ তৈরি হয় নিয়মিতভাবে ধ্বনি বা উচ্চারণ পরিহার করে, নৈঃশব্দ্যের একটা অন্তর্লীন প্যাটার্নের কাছে শব্দ বা ধ্বনিকে সমর্পণ ক'রে, নৈঃশব্দের দ্বারা শব্দকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে। ছন্দ যে কবিতার ভাষাকে আলাদা করে দেয় তা এতই স্পষ্ট যে, এ নিয়ে আর কথা বাড়ানোর প্রয়োজন নেই।

কিন্তু ধ্বনির ক্ষেত্রে কবিতার ভাষা আরো অনেক ভাবে মুখের ভাষার ধ্বনিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর একটা উপায় হল লোপ (deletion)। কবিতায় ব্যবহৃত হয়ে অনেক শব্দের (word-এর) ধ্বনিগত চেহারা থেকে একটি বা দুটি ধ্বনি খসে যায়। যেমন ইংরেজি কবিতায় মিলের খাতিরে বা ছন্দের খাতিরে Over হয়ে যায় O'er, never হয়ে যায় ne'er, it is হয়ে যায় 'its, there is হয় there's, lord হয় lor', betwixt হয় 'twixt ; বাংলাতেও 'উপরে'-র জায়গায় 'পরে, 'তোমায়'-এর জায়গায় 'তোমা' 'দেখিয়া'র জায়গায় 'দেখি' 'মুখখানি'র জায়গায় 'মুখানি' 'পড়লি-'র জায়গায় 'প'লি', 'চিহ্ন'-এর জায়গায় 'চিন্', 'গাইবে'-র জায়গায় 'গাবে' ইত্যাদি। আরেক উপায় হল সংযোগ (addition)। তাতে ছন্দের প্রয়োজনে একটি শব্দের সঙ্গে কিছু ধ্বনি বা

সিলেব্‌ল যোগ করে তাকে একটু টেনে বাড়ানো হয়। পুরনো ধরনের বাংলা কবিতায় 'ছিলনাক' 'হলনাক' ইত্যাদি প্রয়োগ, হপকিন্‌সের কবিতায় stress বা শ্বাসাঘাতের চিহ্ন দিয়ে অধুনা-বর্জিত উচ্চারণ পুনরুদ্ধার যেমন bell-swarmed (উচ্চারণ swarm-d), wispe'l, lark-charmed ইত্যাদি, বাংলা কবিতায় 'লো' 'গো' ইত্যাদি অতিরিক্ত শব্দভাগ ব্যবহার। নজরুল প্রায়ই 'পৌষ'-কে টেনে 'প-উষ' করেছেন ছন্দের কারণে। আর তৃতীয় একটি প্রক্রিয়া হল রূপান্তরণ (alteration)। এতেও ছন্দ বা মিলের, বিশেষত মিলের অনুরোধে প্রচলিত উচ্চারণের হেরফের করা হয়, চালু ধ্বনিকে বদলে অন্য একটি ধ্বনির অবতারণা করা হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথ 'বালা' বা 'মালা'-র সঙ্গে মিল দেওয়ার জন্য 'আলো'-কে 'আলা' অর্থাৎ 'ও' ধ্বনিটিকে ওই জায়গায় 'আ'-এ রূপান্তরিত করেছেন। ইংরেজ কবি that-এর সঙ্গে মিল দেবার জন্য একসময় got-কে 'gat' করেছেন এইভাবে, অগ্‌ডেন ন্যাশ talcum-এর সঙ্গে মিল দেবার জন্য welcome-কে walcum করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য বাঙালি কবিতে এ ধরনের প্রয়োগ প্রচুর আছে, 'ভবভূতি'-র সঙ্গে মিল দিতে 'জুতা' না লিখে 'জুতি', 'কেট্‌লি'-কে 'কাথলি' এই রূপান্তরণের দৃষ্টান্ত। ধ্বনির সুবিধা আদায় করবার জন্য কবিরা শুধু যে এই তিনটিমাত্র উপায়ের সাহায্য নেন তা নয়, তাঁরা চালু ও পরিচিত শব্দ ছেড়ে অনেক সময় পুরনো শব্দ গ্রহণ করেন (archaism), যেমন ইংরেজিতে thee, thou, durst, steven (time), eftsoons, straight away), phosphor (ভোরের তারা), unshent (unharmed) ইত্যাদি। আবার কখনো তাঁরা নতুন শব্দ তৈরি করেন, যার নাম neologism, লিউইস ক্যারল প্রভৃতি যা করেছেন, আবার কখনো বা অন্য উপভাষা বা অন্যভাষা থেকে শব্দ এনে বসান। যেমন স্কট উপভাষার scone ব্যবহৃত হয় gone বা shone-এর মিল হিসাবে, bronze-এর সঙ্গে কেউ মিল দেন ফরাসি onze-এর বাংলায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও নজরুল ভুজনেই এ ধরনের প্রচুর প্রাদেশিক শব্দ (provincialism) বা অন্যভাষার শব্দ ব্যবহার করেছেন। গত শতাব্দীর বা এই শতাব্দীর গোড়াকার মার্কিনি কবিরা নিগ্রো উপভাষার শব্দ ব্যবহার করেছেন ঠিক এইভাবে। Archaism এবং Provincialism-এর মধ্যে সীমা-রেখা সবসময় স্পষ্ট নয়, কারণ পুরনো শব্দই অনেক সময় উপভাষাগুলিতে থেকে যায়। কিন্তু এই উপায়গুলি রূপান্তর-নির্ভর নয়, নির্বাচন-নির্ভর। অর্থাৎ একটি শব্দ গ্রহণ না করে অন্য একটি শব্দ বেছে নিচ্ছি। এই বেছে নেওয়া ব্যাপারটা

ধ্বনিতেও চলে, কিন্তু 'আলো'-র বদলে 'আলা'-তে যেখানে আমরা একই ঈষৎ রূপান্তরিত একটি চেহারা পাচ্ছি, ঐ তিনধরনের শব্দান্তরে, অর্থাৎ archaism, neologism এবং provincialism-এ আমরা অধিকাংশ সময় নতুন একটি আস্ত শব্দ তুলে আনছি, পরিচিত শব্দটিকে বাদ দিয়ে। এই শব্দ নির্বাচন বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। তাতে দেখব যে, শব্দ নির্বাচনেও ধ্বনির বিবেচনা খুবই কার্যকর থাকে। অর্থাৎ কবিতার মিল এবং ছন্দের মাত্রাও আমাদের বাধ্য করে একটা শব্দের বদলে আরেকটা বেছে নিতে। অন্যান্য (অর্থের, প্রতিক্রিয়ার) বিবেচনা তো আছেই।

৩.

ধ্বনির স্তর পেরিয়ে আমরা পৌঁছে যাই পদগঠনের স্তরে। বাক্যে ব্যবহৃত হতে হলে শব্দের সঙ্গে বিভক্তি, প্রত্যয়, উপসর্গ ইত্যাদি লাগানো হয়, পরিণামে যা দাঁড়ায় তার নাম পদ—একথা আমরা জানি। মুখের ভাষা বা গদ্যের ব্যাকরণে পদ গঠনের নিয়ম যে কবিতার ভাষায় সব সময় মানা হয় না, ব্যত্যয় ঘটিয়ে নতুন নতুন প্রয়োগ সৃষ্টি করা হয়, তার দৃষ্টান্ত অহরহ চোখে পড়ে। নিচের ডানদিকের প্রয়োগগুলি লক্ষ করি—

সাধারণ গঠন	কাব্যিক গঠন
গাহিতে [-ইতে]	গাহিবারে [-ইবারে]
থামাইয়া [-ইয়া]	থামায়ে [-এ]
আসিলাম [-ইলাম]	আসিনু [-ইনু]
তলায় [-আয়]	তলে [-এ]
তাকে [-কে]	তারে [-রে]
মুচকে [-এ]	মুচকিয়ে [-ইয়ে]
জন্মে, জন্মিয়া [-এ, ইয়া]	জন্মি, জন্মিয়ে [-ই, ইয়ে]

শুধু প্রত্যয় বিভক্তি নয়, স্ত্রীলিঙ্গ, নির্দেশক বা অন্যান্য ব্যাকরণগত চিহ্নও ছন্দ-মিলনের কাব্যিক প্রয়োজনেই জুড়ে দেওয়া হয়, যেমন 'বিষাদিনী বীণা', 'অনাথিনী আশা', 'মুখটি' না বলে 'মুখখানি', 'ফুলগুলি' না বলে 'ফুলকুল', 'ফুলচয়' ইত্যাদি। মাত্রা রক্ষার কারণে অতিরিক্ত বিভক্তির প্রয়োগ ঘটে, 'সমুখেতে', 'বুকেতে', আবার কখনো কখনো বিভক্তির লোপও ঘটে, যেমন বাঁশরি বাজিছে 'দূর দূর' ('দূরে দূরে' না লিখে), 'বশি মোর পাশ' ('পাশে' না লিখে)। নিশ্চয়ার্থক প্রত্যয় 'ই'-র অকারণ প্রয়োগ ঘটে—'নিরাশারই

মতো', 'তোরি', 'তাহারি' ইত্যাদি। মাত্রার প্রয়োজনে 'রে', 'হে', 'লো' গো', 'তো', 'সে' ইত্যাদির অতিরিক্ত ব্যবহার হয়, মধুসূদন বিশেষ্য-বিশেষণের আগে 'সু' উপসর্গ প্রায় ব্যাধিগ্রস্তের মতো জুড়ে যান—'সুনাসীর', 'সুচারুহাসিনী' 'সুশিন্দুর', সুকনকাসন', 'সুপিকপুঞ্জ'। এর বিস্তৃত আলোচনায় পদগঠন-প্রক্রিয়ার ব্যত্যয়ের আরো নানা সূক্ষ্মতর জটিলতা ধরা যায়, কিন্তু এখানে তার অবকাশ নেই।

৪

শব্দ বা পদ-নির্বাচনে আর ব্যত্যয় বা রূপান্তর নয়। সেখানে একটির বদলে আরেকটি শব্দকে গ্রহণ করার প্রসঙ্গ। বাংলা কবিতার ভাষায় আমরা বিশেষভাবে 'কাব্যিক' (poetical) শব্দই কিছু লক্ষ্য করব। এগুলির গদ্যে বা মুখের ভাষায় ব্যবহার নেই, অন্তত মান্য বা স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষায় নেই বলেই এগুলি 'কাব্যিক'। বাংলায় ব্যবহৃত এরকম শব্দের উদাহরণ :

বিশেষ্য : নয়ান, স্বপন, সমীর, বঁধু, মরম, পরান, বিজন (=নির্জনতা), তরাস, দুখ, জোছনা, তটিনী, কানন, নিশাস, তৃষা, সলিল, পিয়াস, সজনী, দিনমান, চিত, বায়, লহরী, পুরব, বারতা, খেলেনা, গগন, কিরণ, আঁখি

বিশেষণ : আধো, চারি, আধেক, মৃদুল, শয়ান, একেলা, মলিন, সুকোমল, বিকল, স্তব্ধ, মগন, রত

সর্বনাম : আপনা, মম, তব, মোর, মোদের, তারে, যেথা, সেথা, কোথা, হোথা

ক্রিয়া (নামধাতুসহ) : কহা (কওয়া), নারা (না পারা), রচা, হেরা উজলা, জিজ্ঞাসা, নিবারা, ব্যাপা, নেহারা, শুধানো, নিমীলা, প্রবেশা, বাহিরা, পসারা, যুঝা, মুদা (=বোজা), মুরছা, ভ্রমা, গ্রাসা, ঝংকারা, তেয়াগা, আওয়া ('আইনু'-তে ক্রিয়ার এই রূপ), ডরানো, শিহরা, উচ্ছ্বসা

অনুসর্গ : পানে, সাথে, প্রায় (=মতো), মাঝার, তরে, হতে (=থেকে), পারা (=প্রায়), সম, লাগি, সনে, পরি (=উপরি), যথা, বাগে, সমুখে।

ক্রিয়াবিশেষণ : সদাই, যেন, আরবার, যবে, কভু, ধীরে, অনিবার, বিরলে, নিরবধি, অনুক্ষণ, মিছা, সভয়ে, সতত, বুঝি, বিফলে, অমনধারা, নিভৃতে, পুন, মধুরে (মধুরভাবে)

তাছাড়া আছে 'কাব্যিক' সমাস। রবীন্দ্রনাথ থেকে তার কিছু উদাহরণ দিই : ঘুমঘোর, সমাধিশয়ন, কেশপাশ, আঁখিপাতা, রবিকর, বরষাজল, জোছনালহরী, অধরপুট, পাষাণপ্রতিমা, গীতগান, জোছনাহাসি, তরুশাখা, হৃদি-মাঝে, সুখগান, মরীচিকা-সুরা, জগত-অতীত, অশ্রুবারি, অরুণকিরণ, হৃদয়-বাঁশি ইত্যাদি।

৫.

শুধু পদ-নির্মাণের বা পদ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে নয়, বাক্যে পদ সাজানো বা অন্বয়ের (syntax এর) ক্ষেত্রেও সাধারণ ভাষার নিয়ম কবিরা প্রায়ই লঙ্ঘন করেন। অর্থাৎ বাক্যে যে-শব্দের যেখানে বসার কথা তার সেই অবস্থানের হের-ফের ঘটানো হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট ও পরিচিত যে পদ্ধতি, তার নাম বিপর্যাস বা inversion। এই বিপর্যাস নানা পদবন্ধের ক্ষেত্রেই ঘটে, রবীন্দ্রনাথের শেষ দিকের গদ্যেও এর নানা দৃষ্টান্ত দেখা যায়। আমরা কবিতা থেকে কিছু উদাহরণ তুলে দিচ্ছি :

	সাধারণ ক্রম	বিপর্যস্ত ক্রম
১.	বিশেষণ+বিশেষ্য	বিশেষ্য+বিশেষণ
	তরুণী উষা	উষা তরুণী
	প্রচ্ছন্ন সুন্দর প্রেমিক	প্রেমিক প্রচ্ছন্ন সুন্দর
	সেই ভালো কথা	সেই কথা ভালো
	কিংকিনীকণিতা বধূ	বধূ কিংকিনীকণিতা
	মায়াবিনী আশা	আশা মায়াবিনী
২	কর্ম+ক্রিয়া	ক্রিয়া+কর্ম
	পা-দুখানি আইনু পূজিতে	আইনু পূজিতে পা-দুখানি
	উদ্ধার করি যে-বাণী	যে-বাণী উদ্ধার করি
	রচনার স্পর্ধা তব থামিতে না চায়	থামিতে না চায় রচনার স্পর্ধা তব
	প্রাণনাথে পাব	পাব প্রাণনাথে
৩.	কর্তা+ক্রিয়া	ক্রিয়া+কর্তা
	রঙপুর দেখা দিল	দেখা দিল রঙপুর
	কালের রথ তাহে চলেছে	চলেছে তাহে কালের রথ
	আমি নমি	নমি আমি

সাধারণক্রম	বিপর্যস্ত ক্রম
এ চোর রামে ছলিল	ছলিল রামে এ চোর
৪ অধিকরণপদ + ক্রিয়া	ক্রিয়া + অধিকরণপদ
যুবতী পদতলে বসিলা	বসিলা যুবতী পদতলে
শেষ বেলায় ধরা দিয়েছি	ধরা দিয়েছি শেষ বেলায়
তোমার ঘরে এলেম	এলেম তোমার ঘরে
শুকতারা পূর্বদিগন্তে দেখা দিল	দেখা দিল পূর্বদিগন্তে

৫. যৌগিক ও সংযোগাত্মক ক্রিয়ার দুই অংশের বিপর্যাস

ছিল না প্রয়োজন, লেগেছে দোল, উঠিল ডাক, এলে না ফিরে, রয়েছি পাতি, না কহিয়া কথা, উঠুক বিকশি, গেল ডুবি, হয় যেন বোধ।

৬. 'না' বিশেষ্য ও সমাপিকা ক্রিয়ার স্থান বিনিময়

না এবং কালে, নাই সৃষ্টিধারা, তবু না হার মানে, তবু সে নহে বাণী, অর্থ তার নাহি জানি।

আরো অনেকরকম বিপর্যাসের উদাহরণ তোলা যায়। এর নানা পরম্পরা আছে, কিন্তু কবিতার syntax-এর এটিই প্রধান ব্যত্যয়ের নিয়ম।

৬.

আবার একটু তত্ত্বের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। মুখের ভাষা এবং গদ্যের ভাষা থেকে এই যে আলাদা হয়ে যাচ্ছে কবিতার ভাষা, এর চরিত্রটি কী? কারো মতে এর চরিত্র প্রাচীনতর ভাষার। টমাস গ্রে নাকি বলেছিলেন সমকালের ভাষা কখনোই কবিতার ভাষা হতে পারে না। তাই বলে কি সে ভাষা প্রাচীনতর হবে। আলোচনা-সূত্রে আমরা দেখলাম যে, প্রথানুবর্তী কবিতায় অনেক সময় প্রাচীন কাব্যভাষার অনুসরণ চলে। গদ্য কবিতার বিচ্ছিন্ন অধ্যায় বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ নিছক রীতির বা শৈলীর বিচারে প্রাচীন ও ধারাবাহিত বাংলা কবিতার ভাষাকেই স্বীকার করেছিলেন। এবং ঐ প্রাচীন ফ্রেমেই কিছু কিছু নিজস্বতা সঞ্চার করেছিলেন। প্রাচীন এই ভাষার আপেক্ষিক সুবিধা ছিল অনেক। কথ্য বা গদ্যের ভাষার তুলনায় এর শব্দভাণ্ডার অনেক বড়ো, অর্থাৎ এতে 'দেখা' এই ক্রিয়াপদটির পাশাপাশি 'হেরা' 'নিরখা' 'নেহারা' 'লখা' ইত্যাদি ক্রিয়াপদও আছে। তা ছাড়া আছে নানা মাপের নানা ওজনের শব্দ। সিলেব্‌লের সংখ্যা অনুযায়ী একটি ছক করে এই নির্বাচন বা choice-এর সুযোগ যে পুরনো কাব্যভাষায় বেশি ছিল,

তা দেখানো যেতে পারে :

শব্দ	অক্ষর সংখ্যা : Syllable ১	২	৩	৪	৫
সর্বনাম	এ	হে			
		তারা	তাহারা		
		ওদের	উহাদের	উহাদিগের	
ক্রিয়া	যাও	যাহ			
	চাই	চাহি			
		বলছে	বলতেছে, বলিছে	বলিতেছে	
		শুনছিল		শুনতেছিল	শুনিতেছিল

কবিতায় যেখানে মাত্রার হিসেব খুব জরুরি, সেখানে সিলেব্‌লের খানিকটা স্বাধীনতা মূল্যবান হয়ে ওঠে সন্দেহ নেই। ফলে বাংলা কেন, প্রায় সব দেশের কবিতাতেই প্রাচীন রীতি-পদ্ধতির দীর্ঘ অনুবর্তন চলে। তার ব্যাপক পরিসরের মধ্যেই কিছু কিছু নতুন উদ্ভাবন ঘটে, কিন্তু তাতে মূল পদ্ধতিটি হঠাৎ আমূল বদলে যায় না।

সাম্প্রতিক ও 'আধুনিক' বাংলা কবিতায় এই প্রথাগত শৈলী পরিত্যক্ত হয়েছে, এমন আমরা লক্ষ করেছি। কিন্তু প্রারম্ভিক আলোচনায় এও দেখা গেছে যে, মুখের ভাষার যত কাছাকাছিই আসুক, কবিতার ভাষা খানিকটা দূরে থেকেই যায়, কখনো সম্পূর্ণ কথ্যতার স্তরে নেমে আসে না।

এই যে সামান্য পার্থক্যটুকু থেকেই যায়, এর চরিত্র কী? চেক ভাষা-বিজ্ঞানী ইয়ান মুকারোভ্‌স্কি (Jan Mukarovsky) বলেছিলেন, কবিতার ভাষা ভাষার একটা norm থেকে সরে যায়, সরে যায় সৌন্দর্যসৃষ্টির কতকগুলি বিশেষ প্রকরণ সমাধা করার জন্য। স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষাই সেই norm, কবিতার ভাষা স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষার নিয়ম ভাঙে—"the standard language is the background against which is reflected the esthetically intentional distortion of the linguistic components of the work, in other words the intentional violation of the norm of the standard। আমরা বাংলা কবিতার ভাষা থেকে ঐ দূরত্বনির্মাণ ও distortion-এর একটা মানচিত্রও মোটামুটি খাড়া করেছি। কিন্তু এতে কবিতার ভাষার স্বরূপ কী দাঁড়ায়? মুকারোভ্‌স্কি বলেন, কবিতার ভাষার কাজই আলাদা। কবিতার ভাষার কাজ হল, অর্থের দিকে পাঠককে সোজাসুজি ঠেলে না দিয়ে, তার নিজের

দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এর নাম মুকারোভ্স্কি দিয়েছেন aktualisace বা foregrounding! বাংলায় বলা চলে সম্মুখন। The function of poetic language consists in the maximum foregrounding of the utterance"। বিজ্ঞানের ভাষায়, কোনো প্রবন্ধের ভাষায় যা ঘটে তা সম্মুখনের ঠিক বিপরীত, তার নাম automatization। সেখানে ভাষার দিকে পাঠক ফিরেও তাকায় না, সোজাসুজি অর্থে পৌছে যায়। কিন্তু কবিতার ভাষায় সে ভাষার মনোহারিত্ব প্রথমে ব্যাহত হয়।

মুকারোভ্স্কির এই কথা আজ সম্পূর্ণ মানা চলে কি না সন্দেহ। ইলিয়াস শোয়ার্টস (Elias Schwarts) নামে সমালোচক তাঁর একটি বইয়ে খুব জোরালো একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। তিনি রবার্ট ফ্রস্ট-এর সেই বিখ্যাত "Stopping by the Woods" কবিতাটি তুলে বলেছেন, এর ভাষায় এমন কী আছে যা ভাষাতে আমাদের আটকে রাখতে পারে? কিছুই না। কেবল প্রথম লাইনে (Whose woods are these I think I know.) একটি বিপর্যাস আছে, তা ছাড়া দেখি, লাইনগুলি ছন্দে বাঁধা—কিন্তু কবিতার ভাষা হিসেবে এর ভাষার তো কোনো চমৎকারিত্ব বা মনোহারিত্ব কিছুই নেই। কাজেই ভাষা নয়, কবিতার পুরো সংগঠন তার ছন্দ তার প্রতীকিতা (এখানে যেমন মৃত্যুর একটি গভীর প্রচ্ছায়া অনুভব করা যায়), তার অভিজ্ঞতা ও অনুভব —সব মিলিয়েই কবিতাটি কবিতা হয়ে ওঠে। ভাষা বাহনের কাজ করে এবং ভাষার প্রয়োগের পিছনে আদিম ও মৌলিক প্রেরণা ভাবের বা অর্থের। কাজেই মুকারোভ্স্কির লক্ষণ-নির্ণয় কেবল বাইরের দিক থেকে, ভিতরের বা সৃষ্টির দিক থেকে নয়। কোনো কবি সচেতনভাবে norm থেকে সরে আসার চেষ্টা করেন বলে তাঁর কবিতা হয় না, তাঁর কবিতা কবিতা হয়ে ওঠার পর দরকার মতো norm থেকে সরে যায় মাত্র। ভাষা-বিজ্ঞান সেই সরে আসার ধরনটিকে খুব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে হয় তো, কিন্তু তা কেন কবিতার ভাষা হয়ে উঠল, এবং কবিতার ভাষার যথার্থ চরিত্র কী, তা সে বলতে পারে কি না সন্দেহ।

মৃত্যুর পরে

আমার মৃত্যুর পরে বৃষ্টি নামলো :
ভয়ংকর তেজস্ক্রিয় বিষ ধুয়ে আদি শ্যাওলা জাগাতে যেমন
প্লিস্টোসিন যুগে হাজার বছর ধরে বৃষ্টি হয়েছিলো।
সেই অকালসন্ধ্যায় আমার মেঘের মুণ্ড রক্তাকাশে
রাহুর মুণ্ডের মতো ভাসমান হ'লে
হু হু করে কোথা থেকে বাতাস নামক বস্তু তৈরী হয়ে এসে
তাকে আরো উঁচুতে ওঠায়।

মঙ্গলে ও অমঙ্গলে হাড়ে মাসে ঢুকে আছে অমর ভাইরাস
নিঃসাড়ে পাড়ছে ডিম কীট ;
নিরেট গোরিলা যদি তার ভাবাবেগশূন্য মনে ভুল করে থাকে
পাথুরে জাঁতার মতো কর্মচক্র ঘাড়ে নিয়ে চলেছে সে—
কঙ্গো বেসিনের কালো অন্ধকার বসন্তও রক্তে ভিজে লাল।

তবে লঘু হও মেঘ—
ফুটো করে বেরোই নিজেকে নিয়ে হালকা আকাশের দিকে।
পৃথিবীকে দিয়ে গেছি আত্মজীবনীটি,
পড়ে দেখো, কী হয়ে ছিলাম—
সমকামী, নপুংসক, চোর, প্রতারক
এভাবে অজ্ঞাতবাস শেষ হ'লো তবে।

ঝরো বৃষ্টি,
আরো লঘু হও মেঘ,
স্বর্গের ঝংকার ছেড়ে আরো উঠি—
তারাদের শীতার্ত আক্ষেপ ছেড়ে আরো উঠি—
নির্বিকল্প বিশাল সন্ধ্যার রেখা ;

কোনো স্থির জানা ভ্রমে ডুবে আছে ;
কত নিচে
বাদুড়মুখের কাছে আধখাওয়া ফলের মতন
দেখা যায় সবুজ পৃথিবী।

অমর দে

চন্দ্রাহত

বাতাসে ধুলোর গন্ধ চাঁদ থেকে সিঁড়ি নেমে আসে
অস্ফুট শব্দের মত জ্যোৎস্নায় ছুটে যায় ছায়া ;
কোন ঘর বাড়ি নেই, পরাভূত মানুষের সারি
চড়াই পেরিয়ে দূরে পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে।
গাছের অবোধ শাখা দৈবাৎ ছুঁয়েছে কারো হাত
পৃথিবীর স্পর্শ নিয়ে চলে যায় পরাভূত মানুষের সারি ;
বাতাসে ধুলোর গন্ধ, চাঁদ থেকে সিঁড়ি নেমে আসে—
ঘড়ির মতন মাথা জেগে থাকে, মগজেতে চাঁদ ঢুকে গেছে।

কবিতাকে

অনূঢ় আকাশ থেকে জলসিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে তার সাথে যাওয়া,
দিয়েছি পৃথিবী চুঁড়ে প্রসাধন, অনুরাগ, প্রশ্রয় দিয়েছি ;
সর্বস্ব নিয়েছে কেড়ে, আমার জীবনধারা কাঁচপোকা টিপ হয়ে জ্বলে তার
উজ্জ্বল কপালে—
সমুচ্চ আকাশ থেকে জলের আঁধার অব্দি মনোময় আশ্চর্য ভ্রমণ।

মৃণাল দত্ত

হাত ১

ষ্টিল হাত কে কাঁধে রেখেছো ?
মানুষের হাত নাকি তাহলে এমন কেন
চমক লেগেছে
এরকম ঠাণ্ডা ও নিঃসাড় হাত মৃতের হাতের মতো
আমার কাঁধের 'পরে কে তুমি রেখেছো ?
চমকে উঠি, ষ্টিল দিয়ে বাঁধানো হাত তাই তাতে
মানুষের হাড় মাংস চামড়ার সংস্পর্শ নেই
উত্তাপ বা উত্তেজনা নেই।

নির্নিমেষ চেয়ে থাকি ষ্টিল হাত কে কাঁধে রেখেছে !

হাত ২

হাত রেখেছো হাতের উপর কিন্তু আমায় ছুঁতে পারনি
ঠাণ্ডা ভারি সীসের মতো একখানি হাত
জড় এবং অটল আমার হাতের মধ্যে ধরা রয়েছে
হাজার বছর আগের মৃত মমির মতো হিম-শীতল।

গ্রামজীবনের হাওয়া

পায়ের নোখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আমি গ্রামের ছেলে,
আমি যাকে বিয়ে করেছি তার চিন্তাভাবনা একটু নগরমুখী হলেও
সেও আসলে গ্রামেরই মেয়ে।
বিয়ের পর আমরা দু'জনেই শহরে চলে এলাম।

তারপর একদিন রতিমিলনের একটু আগে
আমরা ভেবে দেখলাম
সংসারে তাপ-উত্তাপ বড়ো একটা কম নয়,
সেই তাপ-উত্তাপে গ্রামজীবনের একটু শীতলতা লাগানো দরকার।

আমরা যেরকমটি ভেবেছিলাম, কাজ হল ঠিক সেরকমই।
দিন যায় মাস যায় বছর যায়।
কিন্তু একদিন হঠাৎ এক ম্রিয়মাণ সন্ধেবেলায় আমরা দেখে
অবাক হয়ে গেলাম।
দেখি, আমাদের ঠাণ্ডা নিরুত্তেজ জীবনের উপর
অদ্ভুত অদ্ভুত সব পাতা ঝরছে,
ভাঙা বিষণ্ণ পাটকিলে রঙের পাতা।
এমনকী সংসারের ফুটোফাটা দিয়ে মরণের যে নীল আলো
হঠাৎ-হঠাৎ চোখ মটকে যায়
তারও উপর ঝরে পড়ছে পাতার পর পাতা।

আমরা, মানে আমি এবং আমার স্ত্রী, আমরা এখন কী করব
এবং ঠিক কী করা উচিত বুঝে উঠতে পারছি না
এবং ঠিক ঠিক বুঝে ওঠবার অনেক আগেই দেখি
অনেক অনেক দূরে গ্রামজীবন তার ছায়া শিকড়বাকড়
এবং শীতলতা নিয়ে
অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

সম্পর্ক

আবেগের মোম টুপ্‌টাপ্‌ গলে-ঝরে গেছে ;
ভালোবাসা-টাসা ফুটো বেলুনের চোপসানো শরীর ;
চুম্বকের সেই অনিবার টানও নেই—যা বারেবার
শেকড়ে টান দিয়ে কাছাকাছি আনত ;
তবু এই যে এখনও ঘুরে ফিরে ছুটে ছুটে আসি,
পরিশ্রান্ত কাছে বসি, শান্তি ও শুশ্রূষা চাই,
এর কী কারণ কিছুতেই বুঝতে পারি না।

ভুলগুলো এখন আর পায় না প্রশ্রয়,
বরং যৎপরোনাস্তি সমালোচিত।
ক্ষোভের মুহূর্তে ছেড়ে কথা না কইবার মন্ত্রণা
প্ররোচনা দেয়।
এ-ওর বুকের থেকে পাথর সরাবার হাতুড়িটা
সর্বদাই থাকে না এখন আর নিয়ন্ত্রণে।
তবু এই যে এখনও ঝড়ে বাসাভাঙা পাখী হয়ে
ছুটে ছুটে আসি, দুদণ্ড স্থবির বসেই স্বস্তি পাই,
কেন আসি কিছুতেই কারণ বুঝতে পারি না।

তবে কি সম্পর্ক এই—না থেকে কিছুতেই, এই থাকা ?
নষ্ট মোম, ফুটো বেলুনের পাশে
পা মুড়ে বসতে গিয়ে টের পাওয়া বেঁচেবর্তে আছি !

দীঘা—১৯৮৪

সমুদ্রের মুখোমুখি বসেছিলাম আমরা একদিন, কৌতূহলবশে
'আমরা' মানে আমি, আর আরো কেউ কেউ
দেখেছিলাম বিস্তার, কলহাস্যময় দীর্ণ অবয়ব
দেখেছিলাম, শাসন আর তাচ্ছিল্যময় ফাঁদ
ঝাউবিথীর অন্ধকার থেকে উড়ে এসেছিল বালি
ভাতের থালার দিকে

মানুষ, এরকমই, বারবার তবু গেছে সমুদ্রের দিকে
স্নানে গেছে, তারপর সন্তাপে দগ্ধ
বালিশ ও ওষুধের শিশি তীরে ফেলে রেখে—
মানুষ এরকমই বহুবার তবু গেছে সমুদ্রের দিকে
অমনিই বেড়াতে, কিম্বা শখের পিকনিকে

সমুদ্রের ডাকে আমরাও গিয়েছিলাম একদিন, খিল খুলে
দেখেছিলাম নাইলনের জাল, রূপালী আঁশের হাহাকার
সমুদ্রও এসেছিল নাকি
পায়ের পাতার কাছে, হেঁটে হেঁটে, গড়িয়ে গড়িয়ে ?

আমাদের ক্যামেরা ছিল না।

আমি তৈরী

ভেবেছিলুম তৈরী হয়ে আসবো তোমার সামনে। তাই অপেক্ষা করছিলুম
আর অপেক্ষা করতে করতে আড়ালে থাকার লোভ পেয়ে বসছিলো আমায়।

ভেবেছিলুম তৈরী হয়ে আসবো একদিন তোমার সামনে। যখন আসবো
তখন যেন ফিরিয়ে দিতে না পারো। হঠাৎ একদিন দেবদাস আমায় উপহার
দিয়ে গেলো এক ঠুঁটো জগন্নাথ। হঠাৎ একদিন বিকেল বেলায় ঝড় উঠলো
ভীষণ আর হৈ হৈ ক'রে উড়ে গেলো আমার টুকরো টুকরো পত্রের পাতা। উড়ন্ত,
অসম্পূর্ণ পত্রের পেছন পেছন আমিও নেমে এলুম মাঠে।

ঝড় থামার পর অদ্ভুত শান্ত হয়ে এলো চরাচর। সে কয়েক মুহূর্তমাত্র,
তারপর বৃষ্টির ফোঁটায় ভিজতে কেঁপে উঠলো বসুমতী। শৈশব পেরিয়ে,
কৈশোর পেরিয়ে অনেক অনেকদিন পর এই যৌবনের উপান্তে
স্বেচ্ছায় আমিও ভিজতে লাগলুম বসুমতীর সঙ্গে। আস্তে আস্তে মুছে যেতে
লাগলো সাদা কাগজের ওপর নীল কালির আঁচড়।

আমি জানি, ঠুঁটো জগন্নাথটি কে ? আমি জানি, কারা আমাকে থামিয়ে
রাখতে চায়। কিন্তু আমি আর ভয় পাই না। চকিত বিদ্যুৎ এসে আজ
আমায় জানালো, আমি তৈরী।

শ্রীমতী শুকতারা রায়

পুরনো ঢঙের চশমা

সন্ধোস্নান ক'রে বসি. অ্যান্টিক জান্‌লায়।
এতক্ষণ শ্বেত পাথরের 'বাথ্‌টাবে' শুয়ে মনে এলো
মোগল-হারেমের চান ঘর। চারদিকে বেলোয়ারী ঝাড়,
গোলাপ জলের ঝারি। ফ্রেমে বিদেশী আয়না। ঝরণা।
পুরনো বাড়ি। পোড়ো নয়।
একটি ছোট প্রাসাদ বা বড়ো মন্দিরের মতো।
মজবুত। ঐতিহ্যময়। হাতির দাঁত। ঝাড়বাতি। হাতির দাঁত।
হরিণের মাথা। ব্রোঞ্জ। অর্গ্যান্।
ওপর-মহল তালাবন্ধ থাকে। আজ শুধু আমার জন্য খোলা।
স্টাডিতে অজস্র বইয়ের মেলা। ছবির যাদুঘর।
রোদ. ফুলের গন্ধ সবই কেমন পুরনো আতর মেখে আসে ভেতরে।
বাড়ির একাকিনী বাসিন্দা প্রবীণা।
খ্যাপাটে ধরণ।
জানলায় বসে আমিও ডুবে যাই পুরনো ঐতিহ্যে।
বহুদিন ধ'রে এই ঘরটি যেন আমারই প্রতীক্ষারত।
বইয়ের পাতায়, পাতায়, ছবির ভাঁজে ভাঁজে,
ঝাড়ের দোলায় অতীতের নির্যাস পড়ে চুঁয়ে।
দুষ্প্রাপ্য ফরাসী "ওয়াইনের" মতো মাদকতময়।
এ বাড়ি, দূরে, 'শিপ্রানদীর' তীরে মানাতো ভালো।
আমার কেমন স্বপ্নালু ঘোর লাগে—
তাও চেয়ে থাকি সাদার্ণ অ্যাভিনিউর ব্যস্ত জীবনের গতির দিকে
এই জান্‌লা যেন পুরনো ঢঙের একটি চশমা।
ঠিক বসছে না এ যুগের নাকে।
কতো কাছে আবার কত দূরে।
অনিত্য জীবনের ওঠানামা।

সোহিনী

চট্‌কা ভেঙ্গে জেগে উঠ্‌লো পিগ্‌ম্যালিয়ন্?
একদিন ডুমুরের ফুল দেখেছিলেন রাণী রাসমনি!
মাতাল চাঁদের উপ্‌চে-পড়া আলো নয়,
নয় মলয়। নয় বসন্ত।
ভরদুপুর। ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়া। শীত।
শনিবার দুপুরের "আকাশবাণীতে" ভালিয়া লাভির সেক্সি গলায়
রোমান্টিক প্রেমের গান নয়,
নতুন অতিথি দেখে পোষা সারমেয়র উত্তেজিত হাঁকডাকা,
দূরের দ্বীপ নয়, সুদূর পাহাড়তলী নয়।
নয় বেসামাল সমুদ্রের তীর।
একটি ঘর। নির্জন নয়। শব্দে ভরা।
নয় নটীর নূপুর নিক্কণ। কাজের মেয়ের বাসনমাজার ঝঙ্কার।
সদর দরজায় নক্। নয় হঠাৎ আসা কোনো মায়াবিনী!
ঘরণী স্বয়ং।
তাও জেগে ওঠা?
কাঁচঘরের অজস্র আয়নায় অগুন্তি ছায়া…
কতো ছবি কবিতায়, কবিতায়। জ্যান্ত রক্তে দুরন্ত সাড়া জাগানো।
আবার এসব ছাড়িয়ে যাওয়া।
ধরেন রতিপতি অ-দেখা আঙুল অনঙ্গের?
হঠাৎ চেতনা পায় পিগম্যালিয়ন?
নাকি, শাপমুক্ত আজ অহল্যা?

সেফেরিসের একটি প্রবন্ধ: "Art in Our Times"

বিখ্যাত গ্রীক কবি সেফেরিসের "On the Greek style" গ্রন্থের একটি প্রবন্ধ "Art in Our Times" আমার কাছে নানাকারণে তাৎপর্যময় মনে হয়েছে। প্রথমেই বলে রাখি, আমি ওঁর সঙ্গে পুরোপুরি একমত হইনি কখনো কখনো, আবার তাঁর বক্তব্যের সমর্থনও করেছি কখনো। অডেনের "New Year Letter"-এর দুটি লাইন ("Art is not life, and cannot be/A midwife to society") প্রবন্ধের প্রথমাংশে উদ্ধার ক'রে তিনি যে সাময়িক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিলেন, তাকে শুধরে নিয়েছেন একটু পরেই: "When I speak of art, I am not in any way subscribing to the old theory of 'Art for Art's sake'।"

কিন্তু এর চেয়েও জরুরি বিষয় হ'লো, কলাকৈবল্যবাদের বিকল্প হিসেবে তিনি কী অভিনিবেশ করেছেন, কিভাবে জানিয়েছেন জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের অন্তঃস্পন্দময় সম্পর্ক। এ-বিষয়ে তাঁর বক্তব্য হ'লো: And in fact the life of a poet—that conglomeration of impressions, emotions, reactions which are the material of his work—is also a part of the poet that enconspasses him with its own heartburnings, pains, grandeurs and humilations"। এই উদ্ধৃতিটি যদি বিশ্লেষণ করি, তাহ'লে দেখতে পাবো সেফেরিস একদিকে স্বীকার করছেন বহির্বিশ্বের তরঙ্গাভিঘাত, আবেগ, অভিজ্ঞতার আন্দোলন, অন্যদিকে তেমনি আমাদের মেনে নিতে ব'লছেন ব্যক্তিসত্তার নিজস্ব যন্ত্রণা, ব্যথা, গৌরব, এবং অন্তর্লীন বেদনা। আমার তো মনে হয়, এই বাহির ও ভিতরের সহযোজিতা সকলের পক্ষেই শ্লাঘনীয়।

এর পরের সূত্রটি আরো আকর্ষণীয়। সেফেরিস আমাদের জানাচ্ছেন যে একজন শিল্পী তাঁর নিজের কাছে যখন সৎ হবেন, তখনই তিনি তাঁর সমকালকে তাঁর শিল্পের মধ্যে বিধৃত ক'রতে পারবেন। কিন্তু নিজের কাছে সৎ হওয়া মানে কি? একজন উন্মাদও তো ভাবতে পারে সে নিজের কাছে সৎ, একজন ক্যালিষ্টও ভাবতে পারে (এরকম অনেকেই তো ভেবেছিলো) যে তার সততা তার নিজের কাছে ও তার আদর্শের কাছে, কিন্তু তাই ব'লে সমকালের আত্মা

কি তাদের কার্যকলাপে প্রতিবিম্বিত হবে? কিন্তু সেফেরিস মূলত ভাবছেন একজন "শিল্পীর" কথা বা কবির কথা, যিনি তাঁর শিক্ষিত বিবেকের সঙ্গে সর্বদাই আলোচনারত। শুধু তা-ই নয়, এ-প্রসঙ্গে তিনি "কৃত্রিম উপলব্ধি" (superficial consciousness) এবং মৌল জীবনবোধের মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্যের কথা জানিয়েছেন, এবং জানিয়েছেন যে দ্বিতীয়োক্ত উপলব্ধিই তাঁর আলোচনার বিষয়।

একজন শিল্পীর সঙ্গে তাঁর সমকালের সম্পর্কের প্রকৃত সম্পর্ক কি? শুধু কি বুদ্ধিগ্রাহ্য সংযোগ? সেফেরিস বলছেন 'না'। শুধু কি ভাবাবেগ বা ভাবালুতার গ্রন্থী? সেফেরিস জানাচ্ছেন 'না, তা-ও নয়'। তবে? তাঁর উত্তর হ'লো এই যে, এটা একধরনের জৈবিক সম্পর্ক, যা একজন শিশুকে তাঁর জননীর সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে রাখে (Umbicial Cord)। আমি অন্তত এই মতের সমর্থন করি।

তারপর তিনি যা লিখেছেন "In my humble opinion, political poetry, like poetical prose, is one of the most hideous things on earth", তার সঙ্গে পুরোপুরি একমত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। "রাজনৈতিক কবিতা" ব'লতে সেফেরিস কী বোঝাতে চেয়েছেন, "কাব্যিক গদ্য" বলতেই বা কী? রাজনৈতিক কবিতা যদি হয় শুধুমাত্র ফতোয়া-কবিতা বা propaganda poetry, যা কবিতার অন্যান্য শর্তকে অস্বীকার ক'রে শুধুমাত্র উঁচুগলায় একটা কিছু জানাতে চায়, তা'হলে তার কথা আলাদা। কিন্তু নেরুদা কি সেরকম কবিতা লিখেছেন, কিংবা এলুয়ার, বা মায়াকভস্কি? আর "রাজনৈতিক কবিতা" ব'লতে কি আমরা শুধু বামপন্থী রাজনৈতিক কবিতার কথাই ভাববো? দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক কবিতা হওয়া কি সম্ভব নয়, আর সম্ভব নয় কি দু'দলের মধ্যেই কারো কারো হাতে মহৎ কবিতার সৃষ্টি? আমি আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের এই কথাটা বারবার ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। "কাব্যিক গদ্য" নস্যাৎ ক'রতে গিয়ে কি তিনি র‍্যাঁবো, সাঁ জাঁ পের্স, ক্লোদেল, জাক প্রাভের, প্রভৃতির কবিতার কথা ভাবছেন? তা'হলে তিনি ভুল করছেন। বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সমর সেন, অরুণ মিত্র, লোকনাথ ভট্টাচার্য, সন্তোষকুমার ঘোষ, উৎপলকুমার বসু, অনেকেই অনুরণনময় গদ্য কবিতা লিখেছেন। এই মুহূর্তে, অনেক প্রতিশ্রুতিময় তরুণ কবি গদ্যে কবিতা লিখছেন। তবে এঁরা সবাই সুন্দর গদ্যকবিতা লিখেছেন, "কাব্যিক গদ্য" নয়।

তার পরেই অবশ্য সেফেরিস জানাচ্ছেন, "But in order to work, the artist must be left free"। এ-বিষয়ে দ্বিমত হবার কোনো কারণ আমি দেখি না। কিন্তু পৃথিবীর যে কোনো দেশেই, একজন শিল্পী কতোটা স্বাধীন, সে-বিষয়ে ঈষৎ তলিয়ে ভেবে দেখবার সময় এসেছে। আমরা কি পুরোপুরি ভুলে যেতে পারি রাষ্ট্রের শাসন, সমাজের বিধিনিষেধ, প্রতিষ্ঠানের সোনার হরিণ, ক্ষমতাবলম্বী কবিশিল্পীদের অতিরিক্ত ভরণপোষণের দাবি? আমরা মনে করি হয়তো পারি, কিন্তু আসলে পারি না। কিন্তু এ হ'লে শিল্পী-স্বাধীনতার ব্যবহারিক অসুবিধার দু'একটি দিক, কিন্তু আদর্শগতভাবে যে শিল্পী অন্তত মনে মনে স্বাধীনচেতা নন তিনি আসলে শিল্পীও নন। বস্তুত, তাঁর রচনাও ধোপে টিঁকবে ব'লে আমার মনে হয় না।

সেফেরিস অবশ্য এই সূত্রে আরেকটি মন্তব্য করেছেন, তা খুবই বিতর্কাপেক্ষঃ "And if, working in this way, as a free man, the poet happens to creat some propaganda piece, as they call it (it might be, for example The Persians of Aeschylus), thus should not be regarded as a sign of wickedness, but rather as a work which necesserily, inevitably, and obligatorily demands the applause even of the writer's enemies'। আমি তা-ও মানতে রাজি নই, যদিও সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাস প'ড়ে আমি অন্তত এটুকু বুঝতে পেরেছি যে সেফেরিস নেহাৎ হঠকারীর মতো এই মন্তব্য করেন নি।

প্রবন্ধের শেষে সেফেরিস জানাচ্ছেন যে, কবিমাত্রই কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ নন, যিনি আবেগ বা কল্পনা বা উৎকেন্দ্রিকতার আতিশয্যে নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। সেফেরিস নিঃসন্দেহে সদুক্তি করেছেন এ-বিষয়ে। শুধু তাই নয়, তিনি আরো জানিয়েছেন যে "He carries the burden of the responsibility of the struggle between life and death"।

আমরা প্রতিমুহূর্তে এই যুযুধান জীবন মৃত্যুর উন্মথিত আঘাত-প্রত্যাঘাতে জর্জরিত হ'য়ে থাকি। সেফেরিস ব'লতে চাইছেন, একজন মহৎ কবি এই সংগ্রামের গুরুভার নিজে বহন ক'রে, তারপরে তাকে পাল্টে দেন কবিতায়, চিত্রকল্পে, মানবিক উচ্চারণে। যেমন করেছেন গ্যেটে, হুইটম্যান, জীবনানন্দ এবং আরো অনেক মহৎ কবি। না হ'লে— সেফেরিস প্রশ্ন করেছেন—"Out of this human condition, in its madness and in its silences, what elements will he conserve?"

বান্ধবী, পিয়ানো, পায়রা

বান্ধবীর পিয়ানো বাজনা লক্ষ্য করছিলাম। চিবুক একটু তুলে,
বাঁ-চোখ ডানদিকে রেখে, ডান-চোখ বাঁ-দিকে, সে একমনে
কী যেন একটা সুর বাজাচ্ছিলো। মিল ও অমিল সব একসঙ্গে
মিলছিলো, আর মাঝেমাঝে দু'এক মিনিট স্তব্ধতা, জানালা-দিয়ে-দেখা
পাশের বাড়ির ছাদে পায়রাটা চোখের সামনে এই পাখা নাড়ছিলো, এই
হারিয়ে যাবার মতো চোখের বাইরে চ'লে যাচ্ছিলো, যেন দৃশ্য-অদৃশ্য সব
কখনো কখনো শুধু পালা ক'রে আসে, চ'লে যায়, ফের ঘুরে আসে,
বান্ধবী (নাকি তাৎক্ষণিক প্রেমিকা), তার কিছুটা ওপরে-তোলা থুৎনি, আর
ভাসাভাসা চঞ্চল চোখের মাঝখানে ফাঁক ভ'রে, ফাঁক রেখে যায়।
আমি তাকে প্রেমিকাই ব'লবো, তাকে প্রেমিকা ব'লতে ভালো লাগে,
কাছে এসে যার, চুলের রেশমে আমি হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম,
তারপর পায়চারি করছিলাম ঘরময়, সমস্ত সময় একী অদ্ভুত শিহর,
পর বা আপন ব'লে কিছু নেই, মাঝেমাঝে সব মিশে যায়—
পিয়ানো, পিয়ানো, আর কম্পিত আঙুল, দুল কানে দুলে ওঠে।
ফোটে কি দান্তের গোলাপ, হাজার হাজার পাপড়ি,
পারাদিসো, হে বিয়াত্রিচে?

লা পালোমা

লা পালোমা, লা পালোমা, স্পষ্ট মানে জানা নেই।
স্প্যানীস, না ইতালীয়? পাখি, নাকি অন্য কিছু? আকাশ, খেচর?
তবু প্রিয় বান্ধবী যখন পিয়ানোয় তরঙ্গিত আঙুল চালিয়ে
"লা পালোমা" বাজাচ্ছিলো, আমি মুগ্ধ হ'য়ে শুনছিলাম।
স্বরগ্রাম বাড়িয়ে কমিয়ে দিয়ে যেভাবে গুণীরা গান করেন,
সেইভাবে তরুণীটি বাজনা বাজালো, কখনো আস্তে, কখনো বা আর কিছু
জোরে।
ঘোরে কেটে গেলো প্রায় পনেরো মিনিট। কীট-পতঙ্গ-ভরা

অরণ্যের ভেতরে কে যেন একটু একটু আগুন জ্বালালো, আলো
কখন যে শব্দে পাল্‌টে যায়, কে জানে? উজানে ভাসলে
সব কিছু সহজ, সরল ব'লে মনে হয়। হাওয়া, শুধু হাওয়া,
আর বান্ধবীর চোখ-মুখ-স্তনের ওপরে আমার কম্পিত হাত—
কে কাকে বাজায়? কেন আমরা বেজে উঠি? কেন বা বাজাই?
লা পালোমা, লা-পালোমা, ক্ষমা নয়, তিতিক্ষাও নয়,
শরীর-ছাপিয়ে-যাওয়া আরেক শরীর, হয়তো হৃদয়, মন,
হয়তো বা অন্য কোনো কিছু! পিছু পিছু কে এসেছে?
কেউ না, কেউ না। শুধু হাওয়া, পর্দা দোলে, পর্দা দুলে ওঠে॥

হাইডেনের "অরেটোরিও"

হাইডেন, সফেন সমুদ্র, তাঁর "অরেটোরিও" অথবা "সৃষ্টি"
গমগম ক'রে উঠলো রাত দশটার রেডিয়োতে। স্রোতে
যে ভাসায় গা, তাকে অনেক, অনেকদূরে যেতে হয়।
কেন বা যাবে না?
রোদে চমকানো নুড়ি? ঘোরাঘুরি করে কারা? যেন বাড়ি-ফেরা
এখন হবেনা, শুধু অপেরার মিশ্রস্বর কান পেতে শুনে
সারারাত জেগে থাকবো। বিশুদ্ধ ধ্বনির সঙ্গে মেশানো গলার স্বর,
কখনো কোনোটা আগে, কোনোটা বা পরে। যাদুঘরে
রাখা ছিলো পুরনো জার্মান বাজনা, এখন কে যেন
তাকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। সা-রা-রা-রা,
জা জাঁক রুসোর সেই আদিম, নির্মল ডাক! হাইডেন
সমস্ত জানতেন, তাই রোদে-জলে-মেশা পৃথিবীর
মূল উৎস গান বাজনার মধ্যে খুঁজে পেতে চেয়েছেন।
আলো? কার আলো? অন্ধকার? কার অন্ধকার?—
কেউ তা জানে না। তবু মঞ্চের ওপরে যেন
নর্তকীর রঙিন শরীর ভেঙে, দুমড়ে, কেঁপে উঠছে,
যেন জল এইমাত্র ছাড়া পেলো, "চলো, চলো"
শব্দ হ'লো এখানে ওখানে। আঘাতে, আঘাতে, প্রতিঘাতে

বেলাভূমি জুড়ে শুধু জেগে রইলো চ'লে-যাওয়া সমুদ্রের
চুম্বন-চিহ্ন। কিছু পরে সব কিছু হয়তো বোঝা যাবে।
আপাতত, হাইডেন শুনে যেন ঘোর-লাগা পাগলের মতো
আমি এপাশ ওপাশ করছি। ভোরে লিখবো কবিতা?

বাঘের পার্তিতা

"পার্তিতা" কেমন খেলা? বাঘ জানতেন, তাই কখনো কখনো
ঝর্ণা-থেকে-ছিটকে-বেরিয়ে আসা জলকণা নিয়ে
শব্দে, ধ্বনির মধ্যে মিলিয়ে দিতেন, নাকি সব যেতো মিশে!
সারাবান্দ্, সারাবান্দ্, পুরনো স্প্যানীস নৃত্য, স্পন্দিত ভ্রমর
যেন ঘোর-লাগা বাগানের ভেতর ভেতর শুধু চঞ্চল গুঞ্জন তুলে
এইমাত্র দূরে চ'লে গেলো। নাকি সব হাতে হাত দিয়ে
নেচে উঠছে। জ্যোছ্‌নায়, আরম্ভ, বিদায় সব এক হ'য়ে গেছে।
গথিক বাঘের কাছে আমরা অনেক পেয়েছি, পাইনি কি?
কখনো নির্জন শব্দ, কখনো বা ধ্রুব গান, আগুন কখনো।
যে-বান্ধবী ষ্টেরিওতে বাঘের পার্তিতা দিয়ে (ইতালীয় শব্দ)
আমার পাশেই এসে বসেছিলো, আমি যার স্তন, উরু, মুখ
স্পর্শ ক'রে বারবার জেগে উঠছিলাম, তার জীবনসংগ্রাম
যেন বাঘের বাজনায় এক অন্য ছন্দে দুলে, চমকিয়ে গেলো।
সারাবান্দ্, সারাবান্দ্, চাঁদ-হাতে-পাওয়া স্বর্গ। আনন্দ-প্রপাত॥

পাগানিনি, ও বান্ধবী

পাগানিনি, ঋণী আমি তোমার বাজনার কাছে। বাজে
একই সঙ্গে সুখ ও বিষাদ, স্বাদ ভ'রে ওঠে মনে।
কাল আমি বান্ধবীর দুচোখে দেখেছি মেঘের মতো নিবিড় বেদনা—
একমনা হ'য়ে আমি বুঝতে চেয়েছি কেন, এইভাবে হঠাৎ হাসির পরে,
চোখ জলে ভরে।
ছায়া মিলে যায় যেন আরেক ছায়ায়, দোলে পাথরে-নুড়িতে এক ঝর্ণার
শরীর।

স্থির কিছু নয়, যেমন তোমার বাজনা, পাগানিনি, যেমন তোমার
বুক থেকে উঠে আসা ভালোবাসা, বান্ধবীর চঞ্চল নয়ন, অনুরাগ—
কোন্ শঙ্খে সব কিছু জেগে ওঠে, পৃথিবীর ভোর জলের ওপরে,
ঘোরে একে একে সব, ঋতুচক্র, ফুল, মালা, ধাবন্ত হরিণ—?
কে মিলিয়ে দিলো সব? নাকি কিছুই মেলে না, শুধু মনে হয়
খেলেনার মতো সব প'ড়ে থাকা মানুষজনের দেহে বিদ্যুচ্চমক জেগে ওঠে।
পাগানিনি, পাগানিনি, এবং অনন্তকাল থেকে ধেয়ে আসা স্পন্দিত তারার
স্রোত
আকাশের বুকের ওপরে। ঘরে তখন কি কেউ ছিলো? কাঁদছিলো
কে? সে কি এমন মানুষী, যাকে স্পর্শে কখনো জাগিয়ে দিয়ে
কখনো শীতের আচ্ছন্ন পাতার মতো ফেলে দেয়া যায় দূরে, মাঠের ওপরে।
কিছুই জানি না। শুধু অনুভব করি। বিদেশী বাজনায় মেলে বান্ধবীর
স্বদেশী শরীর॥

স্ট্রাউসের ঢেউ

প্রথমে কিছুটা জোরে, তারপর আস্তে, খুব ধীরে
নিবিড়ে পৌঁছে দেয় একটি একটি ঢেউ, বান্ধবীর পিয়ানোয় স্ট্রাউসের বাজনা
আমার ভেতরে। ঘরে, কখন কোথায় যেন বিষাদ ঢুকেছে—
তাকে আমরা বোঝবার চেষ্টা করি। প্রহরী সময়, কেউ নয়—
ফাঁকি দিয়ে তাকে, আমরা প্রেম করি, কখনো করি না।
আগেও তো স্ট্রাউস শুনেছি বান্ধবীর চঞ্চল আঙুলে, পিয়ানোয়,
হায়, সে আরেক "ডানুব", খুব ভোরবেলা ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মতন,
কিন্তু আজকে যা শুনলাম, তার ঢেউ ক্রমশ ছড়িয়ে যায় বেদনার মতো,
কতো ভালোবাসা আছে স'রে স'রে যাওয়া ঐ জলের ভেতরে, কারা জানে
প্রথমে উজানে, পরে মন্থর ভাঁটায় ভেসে যায় সমস্ত জীবন।
মন, আমি তাকে শান্ত হ'তে বলি, মন শান্ত হয়।
সমস্ত সময় জাল গুটানোর শব্দ, মনে হয় ভেতরে কোথাও
ভারি কিছু উঠে আসছে। আমি হাত বাড়িয়েছি, ছুঁয়ে দিই।
সামনেই তুমি আছো, হে বান্ধবী। আমি আছি। স্ট্রাউসের ঢেউ বিছানায়॥

কাদম্বরী ও গদ্যসাহিত্যে শিল্প-বিচার। ডঃ হৃষীকেশ বসু। ১৫·০০
কাল্পনিক সংবদল। ডঃ মদনমোহন গোস্বামী। ৫·০০
মনুর বর্ণাশ্রম ধর্ম। ৺হীরেন্দ্র নাথ দত্ত। ১৫·০০
রাজকোট রাজপথ রাজঘাট। ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী। ৪·০০
আশুতোষ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংকলন। শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য। ৮·০০
রবীন্দ্রকাব্যে অলঙ্কার। ডঃ জটাধারী মালাকার। ২০·০০
ভাঙ্গিল ঈনীড। হৃষীকেশ বসু ও রবের আঁতোয়ান। ২০·০০
বাংলা ছন্দ। তারাপদ মুখোপাধ্যায়। দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। ৪০·০০

TERMS & CONDITIONS

1. All correspondence should be addressed to The Registrar, JADAVPUR UNIVERSITY, CALCUTTA-700 032, INDIA.
2. Prices in Rupee do not include cost of postage, freight, packing etc., which are to be borne by the customer. Books are sent to countries outside India by sea mail, postage free.
3. All cheques, drafts and money orders are payable to JADAVPUR UNIVERSITY, CALCUTTA.
4. Discounts of 20% is allowed to Booksellers only. Discounts of 40% on the price (exeluding V. P. and other charges) of each book are allowed provided the Booksellers, agreeable to act as Agents, buy not less than 10 copies of any publication at a time. Overriding discount of 5% over and above 4% may be given to the Selling Agents/Distributros willing to sell more than 500 copies of any publication within a limited period of time.
5. All prices are subject to change wihtout notice due to reasons beyond our control.

JADAVPUR UNIVERSITY
Calcutta-700 032 India
Phone : 72-4044